সেই পুরাতন কথা

নীলিমা দেবী

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ, ১৩৬১

প্রকাশক

দুর্গাশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৪ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ছেপেছেন

দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া

৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক

ব্লকম্যান

মুদ্রণ

ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

পরিবেশক

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭

দাম তিন টাকা

যাদের কাছে উৎসাহ না পেলে আমার
এ বই অসমাপ্তই থেকে যেত—
আমার ছেলে মেয়ে—
রাণু
বেণু
পুতুল
ও
চাঁদুকে

লেখিকার আরও একটি বই

অপরাজিতা ১৲

সেই পুরাতন কথা

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে অর্থহীন শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

ঘরের নোনাধরা দেওয়ালগুলো যেন সরে এসে তাঁদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল। বিবর্ণ মুখে বোবা ভাষায় হতাশভাবে জিগ্যেস করতে লাগল,—তাইত! তাহলে কি হবে?

একই সঙ্গে তাঁদের দুজনের শঙ্কিত দৃষ্টি তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদের মত বিছানায় শায়িত একমাত্র সন্তানের মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই স্বামীর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল স্ত্রীর ক্ষীণ শুভ্র শঙ্খবলয়শোভিত দুটি বাহুর দিকে।

ডাক্তার এইমাত্র বলে গেলেন,—যাক আর কোন ভয় নেই।

তারপর রোগীর হাতের আঙ্গুল, চোখের কোণ পরীক্ষা করে গম্ভীর হয়ে বললেন,—কিন্তু শরীরে রক্ত একদম নেই। যদি বাঁচাতে চান তাহলে শীগ্রী কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যান।

ঝুমির বিবর্ণ গালে মৃদু টোকা দিয়ে আদর করে বললেন,—'কি খুকী চেঞ্জে যাবে ত? সমুদ্রের ধারে—পুরীতে?'

'সমুদ্র!' রোগ-পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে ক্লান্ত বড় বড় দুটি চোখের কোলেও ঝুমির জীবনের জোয়ার এসে লাগল যেন।

'সমুদ্র?' বলে বিশীর্ণ মুখে হেসেছে—। সমুদ্রের স্বপ্ন দেখতে দেখতেই বুঝি সে সমুদ্রের মতই নীল দুটি চোখ বুজে অগাধ প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রসন্ন হেসে আরেকবার চেঞ্জে নিয়ে যাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, ডাক্তার তাঁর দর্শনী নিয়ে চলে গেছেন। দীর্ঘ একুশ দিন রোগভোগের পর, আজ ঝুমির জীবনের সম্বন্ধে আশা করা যাচ্ছে।

কিন্তু জীবনের আশা কি এখনও করা যায়?

হাওয়া বদল করতে পারলে হয়ত তা করা যেত, কিন্তু তা যে সম্ভব হবে মনে ত' হচ্ছে না।

বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে, তাঁদের দর্শনী আর ওষুধ-পথ্যেই ব্যাঙ্কের পাশবুক শূন্য হয়েছে, অবশেষে স্ত্রীর গয়নাও বাঁধা পড়েছে।

সেই গয়না বিক্রী করলেও যে চেঞ্জে যাওয়ার খরচ চলবে তারও কোনও সম্ভাবনা নেই।

মধ্যবিত্ত ঘরে কতটুকু আর অসময়ের সম্বল থাকে?

এই সংকীর্ণ গলির ভেতর জীর্ণ একতলা বাড়ীটি, আর স্ত্রীর গায়ের সামান্য কিছু অলঙ্কারই ভবিষ্যতের পাথেয়।

মানুষের শরীর, কিছুই বলা যায় না, দৈবাৎ যদি তাঁর কিছু হয়, তাহলে একেবারে যেন রাস্তায় না দাঁড়াতে হয়; এই ভেবেই বাড়ীটা বাঁধা দিতে তাঁর সাহস হয় না।

বাঁধা-দেওয়া গয়নাগুলোই সোমদেববাবু কতদিনে ছাড়াতে পারবেন কে জানে! কে জানে জীবনে আর সেগুলো ছাড়াতে পারবেন কিনা! তবুত বাড়ীটা থাকবে মাথা গোঁজবার। না-না এ তিনি কিছুতেই বন্ধক দেবেন না।

কিন্তু তাহলে কি হবে? মনে পড়ল তাঁর মৃত পুত্রের কথা,—শৈশবেই তার মৃত্যু হয়েছে! মাত্র তিনদিনের জ্বরে সে তাঁদের ছেড়ে চলে গেছে। ডাক্তারে রোগ ধরতে পারেনি।

চিকিৎসা তার হয়েছিল, তবু সোমদেববাবুর মনে হয়,—পিতার কর্ত্তব্য তিনি করতে পারেননি।

চিকিৎসা তার ঠিকমত হয়নি। আরও বড় ডাক্তার দেখালে সে হয়ত অসময়ে চলে যেত না।

এবার তাই আর আক্ষেপ রাখেননি। সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করে বড় ডাক্তার দেখিয়েছেন।

তবু উজলের মত ঝুমিকেও কি শেষে আর রাখা যাবেনা?

ভগ্নস্বরে বিবর্ণ মুখে স্বামীর দিকে চেয়ে কমলা বলে উঠলেন,—'তাহলে কি হবে?'

চমকে উঠলেন সোমদেববাবু। তাঁর মনের চিন্তারই যেন এ প্রতিধ্বনি!

নতমস্তকে কতক্ষণ তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বললেন, 'শুভেন্দু এবার পুরী যাবে শুনেছিলুম না—?'

নতমুখে কমলা বললেন,—'হ্যাঁ।'

'তোমায় কোন চিঠিপত্র লেখেনি, না?' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জোর করে সমস্ত সংকোচ যেন ঝেড়ে ফেলে সোমদেববাবু আবার বললেন, —'তা হোক। গরীবের আবার মান-সম্মান! তুমি লিখে দাও ঝুমিকে নিয়ে তুমিও কিছুদিন ওখানে থাকতে চাও—।'

আলনা থেকে চাদরটা গায়ে ফেলে, তিনি বিচলিত মনকে শা করবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

শুভেন্দুকে? হ্যাঁ, শুভেন্দুকেই লিখতে হবে অবশেষে। সত্যিইত' গরীবের আবার মান-সম্মান কি? নিজের মর্য্যাদা বাঁচাতে গিয়ে কি শেষে সন্তানকে হারাবেন?

না—না—। কোন সংকোচ, কোন অভিমান, কোন অহঙ্কার আর নেই কমলার।

শুভেন্দু গরীব কমলার লক্ষপতি ভাই। অবশ্য সহোদর ভাই নয়, সৎ ভাই। তবু ত সে ভাই, একই পিতার সন্তান তাঁরা, একই রক্ত দুজনের দেহে বইছে,—একই সঙ্গে দুজনে মানুষ হয়েছেন।

তার কাছে দীন ভিখারীর মত প্রার্থনা জানিয়ে যেতে সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

শৈশবের টুকরো টুকরো নানা ছবি কমলার চোখে ভেসে উঠতে লাগল।

মনে পড়ল সৎমা দয়াময়ীর কথা। তাঁর দয়া জীবনে কমলা ভুলবে না। শুনেছেন শৈশবে তাঁরই কোলে লালিত হয়েছেন, কিন্তু জ্ঞানে তাঁর স্নেহ পান নি। সম্ভবতঃ—শুভেন্দু আসার পর থেকেই কমলা ক্রমশঃ দূরে সরে গেছেন।

গম্ভীরমুখ রাশভারী দয়াময়ীকে কমলা ভয়ই করে এসেছেন, ভাল কোনদিনই বাসতে পারেন নি।

শুভেন্দুতে আর কমলাতে যে কত তফাৎ তা ক্রমশই তিনি বুঝতে লাগলেন। ভাই বোনে ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি হলেই বাঘিনীর মত দয়াময়ী ছুটে আসতেন।

আর ঝি-চাকরদের সঙ্গে সমানভাবেই চলত কমলার লাঞ্ছনা।

তবু কমলা ছোট ভাইকে প্রাণ দিয়েই ভালবাসতেন; আর ভাল বাসতেন তাঁর রোগজীর্ণ ভালমানুষ বাবাকে। কমলা ভীত হয়ে দূরেই থাকতেন শুভেন্দুর কাছ থেকে, তাতেও মন্তব্য শুনতে হত,— সাতটি নয়, পাঁচটি নয়,—একটা মোটে ভাই, তাকেও সইতে পারে না? মাগো! এ মেয়ে বড় হলে কি হবে!

কমলা লুকিয়ে চোখের জল মুছতেন। নবেন্দুবাবু খুবই ভালবাসতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ভীরু,—স্ত্রীর সামনে নিজের সন্তানকে আদর করবার পর্য্যন্ত তাঁর সাহস ছিল না। লুকিয়ে সুযোগ পেলে কমলাকে আদর করতেন। কমলার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন তাঁরই এক বাল্যবন্ধুর ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি বাপের একমাত্র সন্তান।

স্বাস্থ্য, রূপ, বিদ্যাবুদ্ধিতে সে বরণীয় পাত্র; কিন্তু অর্থহীন। জানতেন কমলা সেখানে আদরে থাকবে যা সে নিজের বাপের বাড়ীতে কোনদিন পায়নি।

আর অর্থ? সে ত' তিনি তাকে দেবেনই।

নানা জায়গায় তাঁর বাড়ী আছে, ভেবেছিলেন তারই একটি মেয়েকে লিখে দেবেন। আর ব্যাঙ্কে কমলার নামে মোটা অঙ্কের একটি চেক লিখে দিয়ে, চিরদিনের অনাদরের প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

সম্বন্ধ স্থির করে মেয়েকে গোপনে আদর করে বলেছিলেন,— বড়লোকের বাড়ী তোকে দিচ্ছিনা বলে মনে দুঃখ করিসনা কমলা। বড় লোকের ছেলেরা বড় অপদার্থ হয়। আমি যার হাতে তোকে দিচ্ছি সে কখনও তোর অমর্য্যাদা করবে না। সেখানে চিরকাল তুই

আদরে থাকবি। আমি ত' তোর হতভাগা বাপ, তোকে কোনদিন আদর করতে পারিনি মা!

বলতে বলতেই তাঁর দু'চোখ ছাপিয়ে জল শীর্ণগালের ওপর ঝরে পড়েছিল।

পিতার বুকে মুখ লুকিয়ে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কিশোরী কমলা বলেছিল—কেন বাবা,—তুমি ত' আমায় খুব ভালবাস,—খুবই ত' আদর কর।

কন্যার মাথাটি বুকের ভেতর চেপে ধরে চোখের জলে তার মাথাটি ভিজিয়ে দিয়ে, স্বর্গতা স্ত্রীর কাছে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন নবেন্দুবাবু।

কিন্তু এ ইচ্ছা তাঁর সফল হয়নি। কমলার বিয়ে তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। পারেননি তাকে বাড়ী বা টাকাকড়ি কিছুই দিয়ে যেতে।

অকস্মাৎ পরপারের আহ্বানে তাঁকে আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রেখেই চলে যেতে হয়েছিল।

দয়াময়ী এক বৎসর পরে সেই পাত্রের সঙ্গেই কমলার বিয়ে দিয়েছিলেন।

নির্লোভী দরিদ্র মহাদেববাবু কোন দাবী করেননি। দয়াময়ীও সামান্য অলঙ্কারে কণ্টক বিদায় করেছিলেন। নবেন্দুবাবুর বন্ধুবান্ধবেরা বিস্মিত হ'য়েছিলেন, গোপনে নিন্দাও করেছিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁরাও কিছু বলেননি।

সত্যি বলবার কিই-বা ছিল? বাংলা দেশের মেয়েদের পিতার সম্পত্তির ওপর কিসের অধিকার? জোরই বা কিসের?

পিতৃ-মাতৃহারা কমলা যে সুপাত্রে পড়েছে এইটুকুই যা সান্ত্বনা।

একজন বন্ধু নাকি মহাদেববাবুকে পরামর্শও দিয়েছিলেন পণ ও গহনা বলে কিছু দাবী করতে।

কিন্তু মহাদেববাবু দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি লক্ষ্মী-প্রতিমার মত মেয়েটিই শুধু চেয়েছিলেন, তাকেই পেয়েছেন। আর কিছুতেই তাঁর লোভ নেই। বন্ধুরা তাঁর নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে বিরক্ত হয়েছেন।

টাকা নিলে মেয়েটারই থাকত!

রাজার মেয়ে হয়েও তাকে দরিদ্রের ঘরণীর সাজে দরিদ্রের ঘরে আসতে হল। একি কম দুঃখের কথা! কমলা কিন্তু নিজেকে কোনদিন অসুখী মনে করেননি। বরং পিতার সংসারে সদা সঙ্কুচিত অপরাধীর মত থাকার চেয়ে এই ছোট্ট বাড়ীটির সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হয়ে নিজেকে বড় সৌভাগ্যবতীই মনে করেছিলেন।

সংসারে শাশুড়ী ছিলেন না, কিন্তু মহাদেববাবুর আদরে কমলা তাঁর অভাব বুঝতে পারেননি। মহাদেববাবু সামান্য কেরাণী ছিলেন, কিন্তু তবু তাঁদের সংসারে কোন অভাব অনটন ছিল না। আর পিতার সংসারে সব চেয়ে যেটির অভাব ছিল এখানে তারই প্রাচুর্য্য ছিল বড় বেশী। শ্বশুরের স্নেহে, স্বামীপ্রেমে কমলার ভীত সঙ্কুচিত ভাব ক্রমশ কেটে যেতে লাগল।

যেন একটি কোমল-গন্ধ ভীরু কোরক, আলো আর উত্তাপে বিকশিত হয়ে উঠল।

বাপের বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ কমলার বিয়ের পরই প্রায় উঠে গিয়েছিল।

বিয়ের পর আটদিনের জন্যে বাপের বাড়ী গিয়ে সেই যে তিনি শ্বশুরবাড়ী ঢুকেছিলেন আবার গিয়েছিলেন সেই শুভেন্দুর বিয়ের

নিমন্ত্রণে। বড় ধূমধাম করে বড়লোকের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে শুভেন্দুর বিয়ে হয়েছিল।

আত্মীয়-কুটুম্ব সব এসেছিল দয়াময়ীর বাপের বাড়ীর লোকেরা। তাদের আদর আপ্যায়নে তিনি এত ব্যস্ত থাকতেন যে কমলা বা তার শিশুপুত্র উজলের দিকে চাইবারও তাঁর সময় হ'ত না।

সোমদেববাবু পৌছে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

বড়লোকের বাড়ী একরাত্রি বাস করাও তাঁর সসর্প গৃহবাসেরই সমতূল্য ছিল।

প্রত্যেক মধ্যবিত্তের মতই তাঁরও আত্মসম্মানবোধ ছিল অতি উগ্র রকমের।

কমলার প্রায় কিছুই অলঙ্কার ছিল না,—শ্বশুরবাড়ীর ঐশ্বর্য্য নিয়ে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারে গল্প করবারও কোন্ বিষয় ছিল না; তাই তিনি কোনই আমল পেলেন না।

সঙ্কুচিত সন্ত্রস্ত হ'য়ে কিছুদিন কাটিয়ে, নিজের ক্ষুদ্র কুটিরে ফিরে এসে তিনি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। তাঁর দৈন্য নিয়ে অনেক হাসি টিট্‌কিরী ও মন্তব্য তাঁর কানে এসে পৌছেছিল। কথাগুলো বিষাক্ত তীরের মতই তাঁর বুকে এসে বিঁধেছিল। ভ্রাতৃবধূর বাপেরবাড়ীর লোকেরাও নিমন্ত্রণে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি।

যেখানে ঐশ্বর্য্যের মাপকাঠিতে মানুষ মানুষকে বিচার করে,—সেখানে আর যাবেন না, অপমানিত কমলা মনে মনে এই প্রতিজ্ঞাই করে এসেছিলেন। শুভেন্দুকে হিংসে করেননি কোনদিন,—কিন্তু বড় মর্ম্মান্তিক তাঁর লেগেছিল।

একই পিতার সন্তান তাঁরা,—তবু এত পার্থক্য কেন? আজ তাঁর দারিদ্র্য নিয়ে বাইরের লোকে তাঁকে উপহাস করতে তাচ্ছিল্য করতে সাহস করে!

নিজের বাপের বাড়ীতেও আজ আর তাঁর কোন স্থান নেই।

প্রথম প্রথম ভাইফোঁটায় তিনি ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করে ধুতি-চাদর পাঠিয়েছেন, ভাইকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন।—কিন্তু সে চিঠির উত্তর আসেনি,—এসেছে প্রণামীর টাকা!

ভগবান জানেন একটিমাত্র ভাইয়ের ওপর কমলার কত স্নেহ ছিল, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে সে ভালবাসাকে স্বীকার করেনি কোনদিন।

সোমদেববাবুই অবশেষে বারণ করেছেন উপহার পাঠাতে বা নিমন্ত্রণ করতে।

বড়লোক ও গরীবলোক দুই জাত,—তাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা থাকতে পারেনা—ক্রমশঃ স্বামীর এই কথা কমলাও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছেন। তবু আজও ভাইফোঁটার দিন দেওয়ালে ফোঁটা দেবার সময় ভাইয়ের মুখটিই চোখের সামনে ভেসে উঠে, চোখে জল এসে পড়ে।

আজও তার ভালই চান,—আজও তার সুখে সুখ আর দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন।

নবেন্দু দত্তর বাবা ধর্ম্মদাস দত্ত রেঙ্গুনে কাঠের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে দেশে ফিরে আসেন। তারপর কেনেন বিরাট জমিদারী। হাওড়ায় তাঁর প্রাসাদতুল্য বাড়ী।

পুরীতে, কাশীতে, মধুপুর, গিরিডিতে চারখানা বাড়ী শুধু বেড়াতে যাবার জন্যেই আছে।

নানা জায়গায় তাঁর টাকা খাটছে। যে টাকা ধর্ম্মদাস দত্ত রেখে

গিয়েছিলেন তার কত গুণ যে আজ বেড়ে গেছে, কে তার খবর রাখে?

তবু অনুমান যা করা যায়, গরীব কমলার পক্ষে তা অবিশ্বাস্থ রকমই বেশী।

হাওড়ায় থাকেন শুভেন্দুবাবু, অথচ কমলার কোন খোঁজ নেন না।

কমলাই বা আজকাল আর কোথায় চিঠি লেখেন? না,—চিঠি লিখতে তিনি সাহস করেন না। কিন্তু খোঁজ তিনি রাখেন।

এই সরু গলিটি পেরিয়েই বিবেকানন্দ রোডের ওপর শুভেন্দুর ভায়রা ভাইএর বাড়ী। সেখানে প্রায়ই তিনি সস্ত্রীক বেড়াতে আসেন, কিন্তু কমলার বাড়ী তাঁর পদধূলিতে ধন্য হয় না।

সেই ভাই,—সে এবার পূজোর ছুটির আগেই পুরী যাচ্ছে।—কমলাকে সেইখানেই মেয়েকে নিয়ে চেঞ্জে যেতে হবে। যেচে যেতে হবে তারই বাড়ী, যার কাছে তিনি নিতান্তই অবাঞ্ছিতা।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সজল চোখে কমলা কন্যার মাথায় হাত রাখলেন।

হাওড়ায় তাঁর প্রাসাদতুল্য বাড়ীর অফিস-কামরায় জমিদার শুভেন্দু দত্ত জমিদারীর খাতাপত্র দেখছিলেন। শুভেন্দু দত্ত উচ্চশিক্ষিত।

তাঁর অনেক আমলা কর্ম্মচারী থাকা সত্ত্বেও বৈষয়িক আয় ব্যয়-এর হিসেব তিনি নিজেই দেখেন। ম্যানেজার আছেন, তিনি সব বিষয়ে সাহায্য করেন।

অনেক বড় লোকের ছেলে যেমন কোন না কোন নেশার বশীভূত হ'য়ে অবাধ বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন এবং মোসাহেব

পরিবৃত হ'য়ে নিজেকে একজন মহাপ্রভু ভেবে অহঙ্কারে স্ফীত হন,—শুভেন্দু দত্ত সে দরের লোক নন। তাঁর একটি মাত্র নেশা,—জমিদারীর হিসাব পরীক্ষা। এই কাজে তিনি যা আনন্দ পান,—কোন বিখ্যাত কবি তার কাব্য লেখবার সময় বা কোন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস লেখবার সময় যে আনন্দ পেয়েছিলেন,—তার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

ঘর জোড়া চার ইঞ্চি পুরু গালিচা পাতা। মাঝখানে দামী একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তার সামনে দামী শক্ত একটি কাঠের চেয়ারে সোজা হ'য়ে বসে শুভেন্দু প্রতিদিন নিয়মিত কাজ করেন।

টেবিলের মাঝে একটি ঝক্‌ঝকে রূপোর ট্রেতে নানা রকম ফাউণ্টেন পেন সাজানো আছে। একধারে কাগজ কাটবার একটি ছুরি, পিন-কুশন, আর কাগজ-চাপা রাখা আছে। টেবিলের দুধারে দুটি আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি। একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি ও অন্যটি কর্ম্মবীর বিবেকানন্দের। তাঁদের সামনে দুটি ছোট ছোট রূপার রেকাবীতে সুগন্ধি ফুল। দুপাশের রূপার ধূপদানীতে মহীশূরের চন্দন ধূপ পুড়ে সুগন্ধ বিতরণ করছে।

একধারে ফিকে কমলা রংএর মখমলে মোড়া সোফা সেটি, মাঝে সুদৃশ্য ছোট টিপয়। আর একধারে নরম চামড়া-মোড়া একটি ইজি চেয়ার, তার পাশে মার্ব্বেলের একটি টিপয়।

শুভেন্দু বাবুর বাছা বাছা বন্ধুবান্ধব এলে এইখানেই বসেন দেওয়াল ঘেঁষে দুটি কাঁচের আলমারী সুদৃশ্য মলাটে সোনার জলে নাম লেখা বাছা বাছা ইংরাজী বাংলা কাব্য উপন্যাসে ভর্ত্তি।

অবসরসময়ে এইগুলিই শুভেন্দুর চিত্ত-বিনোদন করে। শুভেন্দু

দত্ত সুপুরুষ, তবে ইদানীং জমিদারতনয়সুলভ স্থূল দেহ তাঁকে ভারাক্রান্ত করেছে।

ফুল স্পীডে ফ্যান চলছিল, তবু তার তলায় বসেও তিনি ঘামছিলেন।

খাতাপত্র দেখা হলে সেগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে, শুভেন্দু কলিং বেল টিপলেন।

একজন আমলা কুণ্ঠিতভাবে সামনে এসে দাঁড়াল। শুভেন্দু নীরবে তর্জনী সঙ্কেতে তাকে দেখিয়ে দিয়ে, রুমালে কপালের কণ্ঠের ঘাম মুছতে লাগলেন।

আমলা কাগজপত্র নিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল। বেয়ারা এসে রূপোর ট্রেতে করে আজকের ডাক রেখে গেল।

শুভেন্দু চিঠিগুলো পড়তে লাগলেন। অধিকাংশই বিষয়-সংক্রান্ত। সেগুলো 'পেপার-ওয়েট' চাপা দিয়ে সরিয়ে রেখে,—একটা খাম তুলে বিস্মিত হলেন।

এ লেখা যে বড় পরিচিত! এতদিন পরে এ চিঠি কিসের জন্যে?

শুনেছিলেন তাদের বড় টানাটানি যাচ্ছে। আর্থিক সাহায্য চেয়েছে হয়ত! দারিদ্রের অহঙ্কার এতদিনে ভেঙ্গেছে তাহলে!

একটা তিক্ত ব্যঙ্গ হাসি শুভেন্দুর মুখে ফুটে উঠল।

উৎসুক হ'য়ে তিনি খামটা ছিঁড়ে ফেললেন।

চিঠিটা পড়তে পড়তেই তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে এল। অন্য-মনস্কের মত তিনি বাইরের দিকে চাইলেন।

কমলা রং-এর সাটিনের পর্দা-ঢাকা জানলা দিয়ে যেটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছিল সেইদিকেই কতক্ষণ চেয়ে রইলেন।

শরৎ-এর নীল আকাশ, শুভ্র মেঘগুলি শিশুর মত অকারণ খুশিতে ভেসে বেড়াচ্ছে।

শৈশব আর কৈশোরের লঘু মেঘের মতই দিনগুলির কথাই মনে পড়ে গেল।

সেই দিদি,—যাকে কতদিন 'কম্‌লি' বলে ডেকেছেন, কত অত্যাচার করেছেন অন্যায় আবদার করে।

পরম ধৈর্য্যে কত সহিষ্ণুতায় সে হাসিমুখে সব সহ্য করেছে। তবু মা'র কাছে যার খালি রূঢ় ভৎ্সনাই পাওনা ছিল!

সেই দিদি আজ নিজে থেকে লিখেছে,—মেয়েকে নিয়ে সে তাঁদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে যেতে চায়।

পড়েছে এক গোঁয়ার-গোবিন্দর হাতে!

হতভাগা কত নীচু কাজই না তাঁর দিয়ে দিদিকে করাচ্ছে! হয়ত সোনার প্রতিমাকে খাটিয়ে আধমরাই করে এনেছে!

সমস্ত মন তাঁর করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠল।

সদর ও অন্দরের দরজার ভারী পর্দ্দাটা সরিয়ে তিনি বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করলেন।

সদর ও অন্দরের সংযোগ রক্ষা করেছে একটি প্রশস্ত দরদালান।

দালানের শেষ প্রান্তে পর পর তিনটি সুসজ্জিত বৃহৎ ঘর। জমিদার-গৃহিনী সুহাসিনীর বিশ্রাম-কক্ষ। দালানে তিন চারজন দাসী পানের ডাবরের সামনে বসে আহারের পর পান সাজতে সাজতে অনুচ্চস্বরে পরস্পরের সুখ-দুঃখের আলোচনা করছিল।

অসময়ে প্রভুকে প্রবেশ করতে দেখে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

দীর্ঘ ঘোমটা টেনে তারা সঙ্কুচিত হ'য়ে আরও সরে বসল। তাদের

ঘোমটার বহর দেখে রাশ-ভারী শুভেন্দুবাবুর মুখেও ঈষৎ হাসির আভাষ দেখা গেল।

তিনি সুহাসিনীর কাছে এলেন।

নিচু আধুনিক ধরণের খাটে, উঁচু নরম গদিতে শুভ্র নরম বকের পালকের মত চাদর পাতা; পর পর দুটি মাথার বালিশের ওয়াড়েও সূক্ষ্ম লেশের কাজ করা। তারই ওপর কালো চুল ছড়িয়ে দিয়ে সুহাসিনী শুয়েছিলেন।

দেওয়ালের ধারে টুলের ওপর রেডিওটা কমিয়ে রাখা আছে। সুহাসিনী স্তিমিতনেত্রে শুয়ে আছেন।

বিছানার পাশে মার্ব্বেলের টিপয়ে এমাসের নানাবিধ মাসিক পত্রিকা ছড়ানো।

দুপুরে তিনি ঘুমান না। কখনও বই পড়ে, কখনও রেডিও শুনে, দুপুর বেলা কাটান।

শুভেন্দুবাবুর দুপুর বেলা কাটে খাতা-পত্র দেখে, বিশ্রাম তাঁর দুপুরে বড় একটা হয়না, যদি কোনদিন কাজ কম থাকে তাহলে পাশের ঘরে তাঁরও একটি খাটে বিছানা আছে, সেইখানেই বিশ্রাম করেন।

তার পাশের ঘরটি তাঁর কন্যা ডলির।

সোফাসেটি দিয়ে সেটি সাজানো। একধারে ডলির নানা রকম খেলার সরঞ্জামও আছে।

সুহাসিনী বড়লোকের মেয়ে। ঈষৎ স্থূল দেহ, চম্পক গৌরবর্ণ মুখের মধ্যে হয়ত খুঁত আছে কিছু, কিন্তু একটি তরল লাবণ্যের জন্যে সেসব কিছু চোখে পড়ে না ঃ পরনে তাঁর অধুনালুপ্ত জরীপাড় নীলাম্বরী শাড়ী, গলায় একটি নিটোল মুক্তোর মালা। দুহাতে দুগাছি প্লেন

বালা। কানে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হীরের কর্ণাভরণ। বাঁ হাতের মধ্যমা ও অনামিকায় হীরের ও নবরত্নের ছুটি আংটি।

শুভেন্দু প্রথমেই এসে ফ্যানের রেগুলেটারটা শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত ঠেলে দিলেন, তারপর রেডিওটা মোচড় দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এসে, খাটের পাশে রাখা কৌচটায় বসে পড়লেন।

স্বামীর কাজকর্ম্ম স্থহাসিনী ভ্রূ কুঁচকে স্মিতমুখে লক্ষ্য করছিলেন, বললেন,—'হঠাৎ অসময়ে?'

চিন্তিতমুখে শুভেন্দু বললেন,—'দিদি একটি চিঠি লিখেছে। ঝুমি খুব ভুগছিল জানত—তাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে পুরী যেতে চায়।'

স্থহাসিনীর মুখ অন্ধকার হয়ে এল। ফ্যানের জোর হাওয়ায় তাঁর খোলা চুল চোখে-মুখে পড়ে বিব্রত করে তুলছিল।

উঠে বসে ছুহাত দিয়ে এলো চুলের খোঁপাটা জড়াতে জড়াতে বললেন, 'তাই নাকি—!'

ফ্যানের স্পীড কিছুটা কম করে দিয়ে এসে, মৃদু হেসে তিনি বললেন,—'মৃণাও যাবে বলছিল,—তাকে না হয় বারণ করে দেব।'

'কি আশ্চর্য্য!' বিরক্ত হয়ে শুভেন্দুবাবু বললেন, 'তাকে বারণ করবার ত' কোন কারণ নেই। বাড়ী আমার এত ছোট নয় যে, দিদি আর ঝুমি গেলেই, মৃণাল আর তার ছেলের জায়গা হবে না।'

'আহা! জায়গার কথা ত' আর হচ্ছে না।'

'তবে?' জিজ্ঞাস্থদৃষ্টিতে শুভেন্দু স্ত্রীর দিকে চাইলেন। মৃদু হেসে স্থহাসিনী বললেন,—'আমার বোনের কাছে তোমার বোন অমন দীন বেশে থাকবে তাতে তোমায় অপ্রস্তুত হ'তে হবে না?'

শুভেন্দু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ একটা সমস্যা ত' বটেই! সোমদেব

বাবুর ওপর তাঁর মন আরও বিষিয়ে গেল। যার স্ত্রীকে গয়না কাপড় দেবার সামর্থ্য নেই, সে রকম অপদার্থ্য লোকের আবার বিয়ে করা কেন! সুহাসিনীর সবদিকেই দৃষ্টি আছে।

তাঁর বিয়ের সময় দিদিকে আনিয়ে, বড়লোক কুটুম্বদের কাছে তিনি আর মা কি কম বিব্রত হয়েছিলেন?

অসহায় দৃষ্টিতে তিনি স্ত্রীর দিকে চাইলেন।

'তাহ'লে কি লিখব বলত?'

'আসতে লিখে দাও।' উদার ভাবে সুহাসিনী বললেন,—'নিজে থেকেই যখন আসতে চেয়েছে, না লেখা কি ভাল হবে? আমি মৃণাকে বুঝিয়ে লিখব এখন, পরে আসবে সে। মাস তিনেক ত' থাকব পুরীতে। তার আগেই নিশ্চয় কমলাদি মেয়ে নিয়ে চলে যাবেন? তাঁরও ত' একলার সংসার, কতদিন আর থাকবেন। চলে গেলে আসবে।'

মুক্তির একটা নিশ্বাস ফেলে শুভেন্দু বললেন,—'তাহ'লে তাই লিখে দিইগে। তুমি মৃণালকে একটু ভাল করে লিখ, দেখ যেন রাগ-টাগ না করে। ডলি কোথায়?'

'ওঘরে খেলছে।—আর দেখ—'

প্রস্থানোদ্যত শুভেন্দু ফিরে দাঁড়ালেন।

'কিছু কি বলছ?'

'হ্যাঁ।' চিন্তিতভাবে সুহাসিনী বললেন,—'হ্যাঁ। কমলাদিকে বিছানা আনতেও বলে দিও। কি রোগ না কি রোগ ঠিক নেই। পুরীই বা যেতে চাইছেন কেন বাবু?'

শুভেন্দু হতবুদ্ধির মতই আবার সোফাটায় বসে পড়লেন।

শঙ্কিত স্বরে বললেন,—'তাই ত'! একথা আমার একবারও মনে হয়নি। তোমার বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সুহাস। কিছুই তোমার নজর এড়ায় না। না—না—আমি বরং আসতে মানাই করে দিই। ঐ সব ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে আমার বাড়ী ছড়াবে, এ আমি একেবারেই পছন্দ করি না।'

মধুর হেসে সুহাসিনী বললেন,—'আহা! ঐ রোগই যে হয়েছে এ তোমায় কে বলল?'—তবে সাবধানের মার নেই, তাই সাবধান হওয়া। বিছানা নিয়ে যেতে বোল, আর ঝিয়েদের ঘরের সঙ্গে যেখানা বড় ঘর আছে সেইটেই ধুইয়ে-মুছিয়ে কমলাদির থাকবার জন্যে ঠিক করে দিলেই হবে। ছোঁয়াছুঁয়ি যতদূর সম্ভব বাঁচিয়ে চললেই হবে। তবে আসতে যখন চেয়েছেন তুমি বারণ কোর না। সেটা ঠিক হবে না।'

অন্ধকার মুখে শুভেন্দু বললেন,—'দেখি, তাই লিখে দি তাহ'লে। বারণ করে দিলেই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল হ'ত। এসব বিষয়ে চক্ষু-লজ্জা করলে নিজেদেরই পস্তাতে হয়। ডলি,—ঐ কচি মেয়ে,—ঝুমিরই সমবয়সী। তাকে তুমি কি করে আটকাবে ওর কাছ থেকে? আমি ওখানে গিয়েই অবশ্য আরেকবার ডাক্তার দেখিয়ে নেব তাকে। কি উৎপাত দেখ দেখি?'

বিচলিতভাবে তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

ক্ষণপূর্ব্বের যে স্নেহটুকু মনটাকে ছুলিয়ে দিয়েছিল সে তখন কোথায় মিলিয়ে গেছে,—তার জায়গায় সারা মনই জুড়ে বসেছে তীব্র বিতৃষ্ণা।

সত্যি, একি উৎপাত!

ট্রেন! ট্রেন!

২

সত্যিই তাহলে রেলগাড়ী চড়ল ঝুমি ?

তাও একটুখানি রাস্তা নয়,—হাওড়া থেকে লিলুয়া নয়,—একেবারে হাওড়া থেকে পুরী, এই দীর্ঘপথ রেলগাড়ীতে পাড়ি দেবে !

হাততালি দিয়ে খুশিতে উছলে উঠল ঝুমি।

কেমন যেন বিশ্বাস হতে চায় না গাড়ীতে বসেও। একটা রাত্র কাটলে তারপর দিন গিয়েই সমুদ্র দেখতে পাবে !

'ঝুমি,—ঝুমি,—রুমি,—টুমি—ঝুম ঝুমি !'

ট্রেনের চাকার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে, বাপের আদরের ডাক ঝুমির কানে বাজতে থাকে।

বাবার জন্যে বড্ড মন কেমন করছে ঝুমির।

তিনিও যদি আসতেন সঙ্গে,—কী মজাই না হ'ত !

পূজোর ছুটি ত' আরম্ভ হল বলে। তখন ত' আসতে পারেন,—কিন্তু তখনও ছুটি নেই তাঁর।

ম্যাট্রিকের দুটি ছাত্র ছুটিতে পড়বে—কি করেই বা আসবেন।

বিছানার ওপর ঘাড়ের কাছে অনেকগুলো বালিশে ঠেসান দিয়ে, ঝুমি বাইরের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে।

গাছপালাগুলো কেমন রেলগাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলে,—ভারী মজা লাগে তার। এতদিন শুনেই ছিল আজ নিজের চোখে দেখতে পেল।

বেড়াতে অবশ্য কলকাতার এদিক ওদিক ট্রামে বাসে গেছে বাবা মা'র সঙ্গে,—এমনকি দক্ষিণেশ্বর বেলুড়ও ঘুরে এসেছে নৌকো করে। কিন্তু ট্রেনে এই প্রথম ! আনন্দে গা শির শির করে ঝুমির। বিশ্বাস হতে চায়না ট্রেনটি শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছবে ত' ?

কমলা মেয়ের পাশে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকেন। বড়লোক ভাইয়ের বাড়ী তিনি ত' আরাম করতেই যাচ্ছেন, কিন্তু সোমদেববাবুর একা ঘরে কত কষ্টই হবে না জানি! গুঁড়ো মশলা শিশিতে শিশিতে ভরে লেবেল দিয়ে এসেছেন। জামাকাপড় বিছানাপত্র রোদে দিয়ে কেচে শুকিয়ে তুলে এসেছেন,—তবু যে ভোলা মন সোমদেববাবুর কে জানে কুকারে রান্না চাপাতেই তাঁর মনে থাকবে কিনা! হোটেলে খেতে তাঁর যা বিতৃষ্ণা! হ'য়ত কোন কোনদিন খাওয়াই হবে না।

শুধু ঝুমির স্বাস্থ্যের জন্যেই তিনি যাচ্ছেন। নাহলে সংসারের এত অসুবিধে করে তিনি যেতেন না। বাপের বাড়ীর আদরের ওপর কোন মোহই তাঁর আর নেই।

ঝুমির জন্যে নতুন এক প্রস্থ বিছানা কিনতে,—দু'শিশি হর্‌লিকস্ কিনে গোটা চল্লিশ টাকা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে,—সোমদেববাবুর হাতে কত যে অবশিষ্ট টাকা আছে—তা কি আর কমলা জানেন না?

সোমদেববাবু সে কথা লুকোবার যত চেষ্টাই করুন,—কমলার জানতে বাকী ছিল না।

মাসের শেষের এই কটা দিন তাঁকে কত কষ্টেই না চালাতে হবে!

টাকা তিনি নিতেন না,—কিন্তু নানা কথা ভেবেই নিয়েছেন। বিছানা নিয়ে যেতে বলাতেই তাঁর মন বিমূখ হ'য়ে গিয়েছিল।

সোমদেববাবু না জানলেও, কমলার ত' অজানা ছিল না। বিছানা সেখানে প্রস্থে-প্রস্থে তোলা আছে।

দেখাশোনা করবার জন্যে বিশ্বাসী লোক আছে। বিছানা সেখানে কোনদিনই কাউকে নিয়ে যেতে হয়না।

কিন্তু গরীবের ঘরে পড়ে কমলা জাতিচ্যুত হ'য়েছেন। তাই অস্পৃশ্য কমলার আর সে বিছানায় শোবার অধিকার নেই।

টাকা কটা তাই স্বামীর টানাটানির কথা মনে করেও ফিরিয়ে দিতে পারেননি।

শাঁখা-পরা কমলা একেই ত' ওদের করুণার পাত্রী হ'য়েছেন,—টাকা কটা হাতে না থাকলে কি আর সেখানে কূল পাবেন?

বড়লোকের বাড়ী যাওয়া বড় বিপদ,—সে বাপের বাড়ী হলেও। কিন্তু সেকথা যে স্বামীকেও বলা চলে না,—সেও কম মুস্কিলের কথা নয়।

ডলি আরেকদিকের বেঞ্চে বসে বার বার মাকে বিরক্ত করেছে ঝুমির কাছে যাবার জন্যে।

হাজার হলেও সে ছেলে মানুষ!

আভিজাত্যের বিষ রক্তের মধ্যে ঘোরালো হয়ে ওঠেনি এখনও,—তাই যাওয়ার বাধা পেয়ে সে অভিমানে ছল ছল চোখে বসে ছিল।

ঝুমিও তার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়েছিল।

দু'একবার চুপি চুপি কমলাকে অনুরোধও করেছিল ডলিকে ডেকে দিতে।

কিন্তু কমলা তার কথার কোন উত্তর দেননি। শুনতে না পাওয়ার ভান করে তিনি বাইরের দিকে চেয়ে বসে ছিলেন।

বেশীক্ষণ সেই নিয়ে মাথা ঘামানোর মত শারীরিক অবস্থাও ঝুমির নয়,—ট্রেনের দোলানিতে সে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুহাসিনী কমলাকে নিয়ে তার শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিতে সঙ্গে আসেন।

স্মিত মুখে মিষ্টি স্বরে বললেন,—'দেখুন কমলাদি, এই ঘরটা আপনার জন্যে ঠিক করেছি। আপনার কোন অসুবিধে হবেনা ত'—?'

'না—অসুবিধে কিসের,—?' কমলা ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বললেন।

ঝিয়েদের ছোট ছোট ঘর দুখানার সঙ্গে লাগা মাঝারি যে ঘরখানা হঠাৎ কোন আগন্তুক আসার জন্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল,—সেই ঘর এটা!

ঘর অবশ্য মন্দ নয়। আলো হাওয়া আছে, তবু কমলার কেমন কেমন যেন লাগে।

সুহাসিনী বললেন,—'রোগা মেয়ে নিয়ে একা থাকতে ভয় করবে হয়ত তোমার,—তাই কমলদি এইটাই ঠিক করলুম। দরকার হলেই তুমি শেফালির মা,—বিধুর মাকে পাবে। তারা ত' তোমার পাশের ঘরেই রইল।"

'হ্যাঁ বৌ,—এই বেশ ভাল।'

হাসিমুখেই বলেন কমলা, তবু স্বরটি কেমন কেঁপে যায়।

বড়লোক ভাইয়ের বাড়ী গরীব বোন, অযাচিত অতিথি হয়ে এসে, এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করতে পারে না। করা উচিতও নয়।

তক্তপোষের ওপর গাড়ীর বিছানাটাই খুলে পেতে দিয়ে কমলা রোগা মেয়েকে শুইয়ে, তার পাশে স্তব্ধ হ'য়ে বসে থাকেন।

বাংলো বাড়ী। সামনের দিকে বড় বড় সুসজ্জিত তিনখানা ঘরই কি লাগবে শুভেন্দুর—?

পাশের তিনখানা ছোট ঘরের একটা কমলা পেয়েছেন। মাঝখানে মস্ত বড় উঠান। তার ধারে এক সারিতে তিনখানা ঘর। রান্না-ভাঁড়ার আর খাবার ঘর। উঠানের একধারে বাঁধানো মস্ত ইঁদারা।

তারই ধারে যে আলাদা বাথরুম,—সেইটিই কমলাদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

শুভেন্দুদের শোবার ঘর সংলগ্ন যে বাথরুম,—সে দুটো কমলাদের জন্যে নয়।

না থাক,—তা নিয়ে দুঃখ করবারও কোন কারণ নেই। আজ যদি গা-ভরা গয়না থাকত কমলার—সঙ্গে একজন চাকর বা ঝি নিয়ে আসতে পারতেন,—স্বামীর জমিদারী না থাক, যদি মোটা মাইনের চাকরীও থাকত,—তাহলে শুভেন্দুর পাশের একটা ঘরে তাঁরও জায়গা হতে পারত।

কিন্তু তা যখন নেই,—একেই মেনে নেওয়া উচিত। তবু ত ভাগ্যে বড়লোক ভাইয়ের বাড়ীখানা ছিল, তাইনা আজ রোগা মেয়ে নিয়ে চেঞ্জে আসতে পেরেছেন।

'ও পিসীমা! তুমি এখনও মুখ হাত ধোওনি—? চা যে ঠাকুরের হয়ে গেছে—!'

চমকে উঠলেন কমলা শেফালির মা'র ডাকে।

বিছানা থেকে কখন ঝুমি উঠে গেছে।

ছি-ছি। রোগা মেয়েকে জামা-কাপড় না ছাড়িয়ে,—তাকে কিছু খেতে না দিয়ে, নিজের ভাবনায় তন্ময় হয়ে আছেন তিনি!

উদ্বিগ্ন হ'য়ে প্রশ্ন করলেন কমলা,—'কোথায় গেল মেয়েটা শেফালির মা—?'

একগাল হেসে শেফালির মা বলল,—'এ্যাই দেখ! কোথাও যাননি গো—। কোথাও যা বাইরে এসে আমার ঠেঁয়ে মুখ-হাত ধোবার

জল চেয়ে নিয়ে তৈরী হয়ে বসে আছেন সমুদ্দুর দেখবার জন্যে—তুমি বুঝি ভাবতে নেগেছ পিসীমা—?'

মৃদু হেসে কমলা বললেন,—'না ভাবব কেন? আমি জানি তোমার ত' আছ; দেখবে তোমরা।'

'তা দেখব বৈকি পিসীমা!' আন্তরিকতাভরা শেফালির মা'র কথাগুলো ভারী মিষ্টি লাগে কমলার।

উঠে বললেন, 'চল শেফালির মা আমায় একটু গরম জল করে দেবে। মেয়েটাকে হর্‌লিক্স্‌ খাইয়েই আমি মন্দিরে যাব। ঠাকুর দর্শন না করে আমি কিছু খাব না।'

চওড়া দালানে সতরঞ্চি বিছিয়ে, চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে সুহাসিনী বসে আছেন।

কোণের ধারে একটা টেবিলে শুভেন্দু জলযোগ করছিলেন; বড় লোক হওয়ার সুবিধে কি কম?

আগের দিনই ঠাকুর-চাকর পাঠিয়েছিলেন বলেই না এমন ঝক-ঝকে ঘরে বসে এমন রাজভোগ মুখে তুলতে পারা যাচ্ছে!

পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে শুভেন্দু সোনালী সুগন্ধ চায়ে চুমুক দিলেন।

একধারের দেওয়াল ঘেঁসে ঝুমি দাঁড়িয়ে আছে। থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বলেই বোধ হয় তাকে কেউ দেখতে পাননি। নাহ'লে ডলি আর সুহাসিনী কি আর তাকে না ডেকেই খেতে বসতেন?

মাকে দেখে ছুটে এসে মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সে বলল,—'বারে! এখনও মুখ-হাত ধোওনি তুমি? সমুদ্র দেখতে যাবে কখন?'

মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে কমলা বললেন, 'সমুদ্র? সে কাল দেখো মাণিক। আজ এই গাড়ীর কষ্ট গেল,—একটু কিছু

খেয়ে মুখ-হাত ধুয়ে বিছানায় লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে থাক। আমি মন্দির থেকে ফিরে এসে তোমায় খুব ভাল একটি গল্প বলব,—কেমন ?'

সুহাসিনী বললেন,—ঝুমি কি খাবে কমলদি? ওকে চা লুচি দেওয়া ঠিক হবে কি ?'

অবাক হয়ে গেলেন কমলা। এখনও তাঁর রোগা মেয়ে কিছুই খেতে পায়নি তাহলে!

ইতস্ততঃ করে তিনি বললেন, – 'চা-টা থাক। দুখানা লুচি দাও,—আমি হরলিক্স্ করে দিচ্ছি।'

'না—আমি কিছু খাবনা।' রাঙা ফ্রক দুলিয়ে রাঙা ঠোঁট ফুলিয়ে,—কোঁকড়া চুলে ভরা মাথা নেড়ে সে বলল,—'সমুদ্র কেন দেখতে দেবে না? আজই দেখব আমি।'

ঈর্ষাভরা দৃষ্টিতে সুহাসিনী তার দিকে চাইলেন। এত ভুগেছে মেয়েটি, তবু কি রূপ!

আধফোটা যেন একটা পদ্মকুঁড়ি! কিইবা খেতে পায়? এই বয়সে ন্যাকামীও বেশ রপ্ত করেছে!

কিসে যে ওকে ভাল দেখায় সে জ্ঞানটিও বেশ টনটনে! আর তাঁর মেয়ে!

মা বাপের রূপের কণামাত্রও পেল না—!

এত ফল দুধ খাওয়ানো,—এত প্রসাধনে ও শ্যামবর্ণকে কিছুতেই গৌরবর্ণের কোঠায় আনা যাচ্ছে না—।

কি বিড়ম্বনা!

শুভেন্দু মুগ্ধনেত্রে চেয়ে ছিলেন ঝুমির দিকে।

তাঁর বুক উদ্বেল হয়ে উঠল। স্নেহ-গম্ভীরস্বরে তিনি বললেন,—

'ঝুমি, লক্ষ্মী মেয়ে,—খেয়ে নাও। আজ বিকেলেই তুমি সমুদ্র দেখতে পাবে। আমি নিজে তোমায় নিয়ে যাব।'

সুহাসিনী হাসিমুখে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাইলেন স্বামীর দিকে, কিন্তু শুভেন্দু ততক্ষণে খবরের কাগজে মন দিয়েছেন।

ঝুমি মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

কমলা মেয়েকে কোলে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলেন। বুকের পাষাণ ভার তাঁর গলতে সুরু হয়েছিল;—না-না—ভাই তাঁর পর হয়নি।

এখনও সে তাঁকে তেমনিই ভালবাসে।

সে যে তাঁর ছোট্ট ভাইটি,—সেই ইন্দু—তাকে যেন তিনি ভুল না বোঝেন।

রাস্তায় নেমে পড়ল ঝুমি,—তারপরেই বালি-আর বালি—ঢালু হয়ে মিলিয়ে গেছে সমুদ্রের সীমানায়। অজস্র পদচিহ্নের দিকে তাকিয়ে ঝুমি ত' এগিয়ে আসছিল—হঠাৎ একি!

এই অকূল-আকুল নীলিম জলরাশি—এই কি তবে রূপকথার সাত-সমুদ্রের একটি?

রূপকথার রাজকুমার কি পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে এরই ওপর দিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনতে যায় দৈত্যপুরী থেকে?

কে জানে অত সে ভাবতে পারে না।

তার বরং মনে হয়,—সমুদ্রটা তার চেয়েও দুষ্টু একটা ছোট্ট ছেলে,—ছুটে এসে মাটির মার কানে কানে বলে যাচ্ছে সুদূর রাজ্যের গোপন সব বার্ত্তা।

দূরের সমুদ্র কত শান্ত দেখ,—কিন্তু মাটির কোলে ফিরে আসার

পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তার সব শিষ্টতা গেল হারিয়ে—দুহাত বাড়িয়ে দুপায়ে লাফিয়ে ভেঙ্গে পড়ল মার কোলে!

তারপর বুদ্বুদের শব্দে গুজ্ গুজ্ করে কত কি যে বলতে লাগল তার আর শেষ নেই।

হাততালি দিয়ে খুশিতে ঝুমিও হেসে উঠে এতক্ষণে সমুদ্রকে অভিনন্দিত করে—'ইস্! কী সুন্দর—কী সুন্দর!'

ভ্রমণরত নর-নারী চকিত হয়ে তার দিকে ফিরে চায়।

দু-একজন মন্তব্যও করে—

'কিন্তু কে বেশী সুন্দর—বলাও যাচ্ছেনা—। সমুদ্র না ঐ ফুটফুটে মেয়েটি?'

'সত্যি ভাই,—সমুদ্রের তীরে মেয়েটিকে ঠিক সাগরিকার মতই দেখাচ্ছে,—না—?'

'কিন্তু বড্ড বেশী রোগা!'

'সেইজন্যেই অপার্থিব,—রোমান্টিক!'

'কিন্তু নেহাৎই খুকী যে! আর তুইও তা ছাড়া—'

'যাঃ—পাগল না মাথা খারাপ—'

দূরে চলে যায় তারা।

আর কিছু শোনা যায় না। কিন্তু যতটুকু শোনা গেছে তাতেই সুহাসিনীর মুখ অন্ধকার হয়ে আসে।

মেয়ের হাত ধরে তিনি আরও দূরে চলে যান।

মেয়ের দিকে বারবার চেয়ে দেখেন তিনি।

আজ তাকে লাল ফ্রক পরিয়ে এনেছেন।

ঘন কালো বব্‌ করা চুলে চওড়া লাল ফিতের ফুলবাঁধা; পায়ে লাল টুকটুকে নরম চামড়ার জুতো।

সুডৌল দুটি বাহু ডলির। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ,—সুন্দর মুখশ্রী।

ঝুমির চেয়ে ডলি কোন্ অংশে নিকৃষ্ট!

তবু কেউ চেয়েও দেখল না এর দিকে!

আশ্চর্য্য!

কটা রং-এর কী এত মহিমা!

দামী সাটিনের লাল ফ্রকে ডলিকে ঠিক একটি ছোট্ট মোমের 'ডলির' মতই দেখাচ্ছে।

ঝুমিকে 'সাগরিকা' মনে হ'ল আর ডলিকে কি একটা পুতুলের সঙ্গেও তুলনা দেওয়া চলত না!

বোধ হয় ঝুমিকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে—কটা রংই শুধু নয়,—সত্যিই মেয়েটার রূপে অনৈসগিক কিছু আছে।

পরনে তার সাগরের মতই নীল পপলিনের ফ্রক—গলার কাছে সূক্ষ্ম লেশের কাজ করা,—ঠিক যেন সাগরের ফেনাগুলো ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে!

কোঁকড়া চুলগুলি কোন ফিতের বাঁধনে বাঁধা নেই,—কাঁধের কাছে এসে আঙ্গুরের গুচ্ছের মত ঝুলছে—সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ে উড়ে চোখে-মুখে এসে পড়ছে। পানপানা মুখ,—টিকালো নাক,—গোলাপের পাপ্‌ড়ির মত রক্তিম ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ। ধনুকের মত বঙ্কিম ভ্রূর নীচে কালো পক্ষ ঘেরা হরিণের মত দুটি চোখ। চিবুকের ডৌলটিও কি সুকুমার। সাজানো মুক্তর মত সুন্দর ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলি,—হাসলে আবার দুটি গালেই তার টোল পড়ে!

একটা দীর্ঘশ্বাস সুহাসিনীর বুক কাঁপিয়ে বেরিয়ে এল। নগ্ন পায়েই চলে এসেছে বুঝি ঝুমি ?

না,—ঐযে তার সস্তা কালো স্যাণ্ডেলটা খোলা পড়ে আছে। পাদুটি পর্য্যন্ত এত সুন্দর ওর,—যেন দুটি শ্বেত পদ্ম। একেই বোধ হয় কবিরা চরণকমল বলেছেন !

আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য !

'এ মেয়ের নাম হওয়া উচিত ছিল পদ্মিনী—'

চমকে উঠলেন সুহাসিনী।

ডলি বিস্মিতনেত্রে মার দিকে চেয়ে বলল,—'কি বলছিলে মা—?'

তাঁর অস্ফুট স্বগতোক্তি ডলি শুনতে পেয়েছে !

লজ্জিত হয়ে সুহাসিনী বললেন,—'কিছু না রে—চল। চল—ঐদিকে যাই আমরা। তোর সব সঙ্গিরা বোধহয় এবার সব আসছে।'

উৎসুক চোখে মার দিকে চেয়ে ডলি বলল,—'যাই মা ঝুমিকেও ডেকে আনি,—বেশ একসঙ্গে খেলবো—?'

ডলি ছুটে যাবার আগেই সুহাসিনী মেয়ের হাত শক্ত করে ধরে বললেন,—'না।'

'বারে !—কেন,—ও আমাদের সঙ্গে খেলবে না—?'

কন্যার প্রশ্নে ঈষৎ বিব্রত বোধ করেন সুহাসিনী।

ডাক্তার দেখিয়ে জানা গেছে ঝুমির কোন রোগ নেই।

ইতস্ততঃ করে তিনি বললেন,—'এই রোগ থেকে উঠেছে—ও তোমাদের সঙ্গে অত দৌড়দৌড়ি করতে পারবে কেন ?'

'আহা ! আমরা বুঝি এখানে দৌড়ই—? এই বালিতে বুঝি দৌড়ন যায়—? কেল্লা করব ত শুধু বালি দিয়ে।'

'না—না—ওকে ডাকতে হবে না। ঐ দেখ না রেবা, বীণা, বেবি, নীলু—সবাই এসে গেছে। এইত কত সঙ্গী—!'

'আচ্ছা মা,—বাড়ী গিয়ে ঝুমির সঙ্গে রান্নাবাড়ী খেলব,—কেমন—?'

মেয়ের কথার কোন উত্তর আর না দিয়ে সুহাসিনী ডলিকে নিয়ে জজ-সাহেবের স্ত্রীর দিকে স্মিতমুখে এগিয়ে আসেন।

সমুদ্র যেন নেশার মত পেয়ে বসে ঝুমিকে।

আশ্চর্য্য এই সমুদ্র,—ক্ষণে ক্ষণে এ রূপ বদলায়।

ভোরে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এর তীর ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করেনা ঝুমির।

ভোরে কোন কোনদিন কমলা ওঠবার আগেই,—শেফালিকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি ঝুমি সূর্য্যোদয় দেখবার জন্যে সমুদ্রের তীরে এসে বসে থাকে। সব সময়েই সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোল,—দুরন্ত দামাল ছেলের মত যেন সে ধরিত্রী মার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে!

অগাধ আলস্যে মা শুয়ে আছেন তাঁর স্নেহাঞ্চল বিছিয়ে দিয়ে। বাৎসল্য-স্নেহভরা মুগ্ধ নয়নে তাঁর শিশুর দিকে চেয়ে আছেন যেন।

সমুদ্র ছুটে এসে তাঁর কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আবার ধরা পড়বার ভয়ে, কৌতুকহাস্যে ছুটে তখুনি চলে যাচ্ছে।

সমুদ্রের ভাষা কিছু কিছু যেন বুঝতে পারে ঝুমি—সব সময়েই সে যেন তার সঙ্গে খেলতে আহ্বান করছে!

সমুদ্রের তীরে ভোরের আকাশটিও কি সুন্দর! আস্তে আস্তে কেমন অন্ধকার হয়ে আসে! রাঙা আলো ছড়িয়ে পড়ে আকাশময়। সমুদ্রেও তার ছোপ লাগে। আর জলের ভেতর থেকে যখন লাল টুকটুকে মুখে সূয্যি-মামা উঁকি মারেন তখন কি মজাই না লাগে!

ঝুমি আর শেফালি হাততালি দিয়ে খুশিতে সমুদ্রের তীরে নাচতে থাকে।

ঝুমির ফ্রক, শেফালির শাড়ী বাতাস লেগে নৌকোর পালের মত ফুলে ওঠে।

দু'হাত ডানার মত ছড়িয়ে তারা নাচে, হাসিতে খুশিতে ঝলমলে চঞ্চল দুটি মেয়েকে রঙিন দুটি প্রজাপতির মতই দেখায়।

ডলির নাগাল পাওয়া যায় না।

ভোরে সে কোনদিনই ওঠে না। যখন বাবা-মা'র সঙ্গে বেড়াতে আসে, চান করতেও আসে মাঝে মাঝে, তখনও ঝুমি তাকে কাছে পায় না।

মার সঙ্গে ঝুমি রোজ সমুদ্র-স্নান করে।

বড় বড় ঢেউগুলো কেমন করে লাফিয়ে কাটাতে হয় বেশ শিখে গেছে।

এত মজা লাগে সমুদ্রে চান করতে!

আর শেফালি? শেফালির মত বন্ধু পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা।

যখন খুশি তাকে খেলতে ডাকে,—হাসিমুখে ছুটে আসে। শেফালির মা,—ডলির মার মত ত' কই তাকে আগলে রাখে না?

সকলে দুপুরে ঘুমলে,—ঝুমি চঞ্চলিকে নিয়ে কতদূর সমুদ্রের ধার দিয়ে চলে যায়, ফিরে আসে কোঁচড় ভর্ত্তি করে ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে।

সকলের ঘুম ভাঙ্গবার আগেই ওরা কেমন লক্ষ্মী মেয়ের মত ঝিনুক নিয়ে খেলতে বসে। সমুদ্র-চান করে ঝুমির কেমন দোলা লাগে। সব সময়,—বসে থাকলেও মনে হয়,—সমুদ্র দোল দিচ্ছে! আরামে মাঝে মাঝে ঘুম পেয়ে যায় তার।

সমুদ্রের নীল জলে কী স্নেহ যে মাখানো!

ঈষদুষ্ণ জল,—ঠিক মায়ের নরম-গরম কোলটির মত! ঈস! কলকাতার গলিতে তাদের বাড়ীটা না হয়ে যদি সমুদ্রের ধারে বাড়ীটা হ'ত! তাহলে ঝুমি আর কিছু চাইত না ভগবানের কাছে।

জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে ঝুমি তাই একটি প্রার্থনাই করে—'হে ভগবান! আমাদের বাড়ীটা তুমি সমুদ্রের ধারে করিয়ে দাও,—তোমার দুটি পায়ে পড়ি।'

কমলা কিন্তু কোন শান্তি পান না।

স্বামীর কথা মনে করে মন তাঁর সব সময়ই বিষণ্ণ হ'য়ে থাকে।

সুহাসিনীর বান্ধবীরা সবাই বড়লোকের স্ত্রী। তাঁর ঘরে আসেন। সেইখানেই বসেন। উচ্চহাস্যে, গল্পে, গানে সময় কাটিয়ে তাঁরা চলে যান। উৎকর্ণ হ'য়ে কমলা নিজের ঘরে চুপ করে বসে থাকেন।

বড় ইচ্ছে করে সবার সঙ্গে গল্প করতে,—কিন্তু যেচে সেখানে যাবার মত নির্লজ্জতা তাঁর স্বভাবে নেই। সুহাসিনী কোনদিন তাঁকে আহ্বান করেন না।

কি রকম একটা গ্লানিকর অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। সব চেয়ে পীড়াদায়ক হ'য়ে ওঠে চঞ্চলির মার কৌতুহল ও সঙ্গ। যখন তখন এসে বসে সে তাঁর সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করে।

গল্পই বা কি! সেই একঘেয়ে বৈচিত্র্য-হীন কাহিনী। তাও না হয় মন দেওয়ার ভান করা যায়,—কিন্তু তারপরই যখন বলে বসে,—'হেঁ গা পিসীমা! তা' তুমি শুধু শাঁখা পরে থাক কেনে গা? চুড়ি বুঝি ভেঙ্গে গেছে? গলায় হারও দাওনা কেনে মা?' অসহ্য লাগল কমলার।

পাথরের মত কঠিন মুখে তিনি বসে রইলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চঞ্চলির মা কথার স্বর পাল্টে ফেলল।

সান্ত্বনার স্বরে বলল,—'গয়না না পরাই আজকাল ফেসিয়ান হয়েছে বুঝি মা—? মার ত' কত গয়না। তা' তিনি ত' অঙ্গেও ছোঁয়ান না। আর ঐ দিদিমণি? একটা মোটে মেয়ে, একরত্তি গুঁড়োটুকু। রাজার মেয়ে,—তবু গায়ে সোনার আঁজি টুকুও নেই। দিদিমা ঐ নিয়ে বকাবকি কম ত' করেন নাই বাবু,—তা' মাকে কিন্তু টলাতে নারলো! দিদিমা ত তাই কাশীবাস করতে নেগেছে—। বলে ই-সংসারে আমি থাকব নাই; আমার কথা থাকেনা ই-খানে।'

কমলা উৎসুক হয়ে শুনছিলেন। কাশীবাস করছেন দয়াময়ী তা' তিনি জানেন,—কিন্তু বধূর সঙ্গে মনোমালিন্যই যে এর কারণ—এতটা জানতেন না! সুহাসিনী ও দয়াময়ী দুজনেই প্রভুত্ব-পরায়ণা—তাই এই সঙ্ঘর্ষ!

লজ্জিত হলেন কমলা। নিজেকে অপরাধী মনে হ'ল তাঁর। ছিঃ—ছিঃ—অন্য লোকের নিন্দে এত মুখরোচক লাগছে তাঁর?

গম্ভীর হয়ে কমলা বললেন,—'থাক চঞ্চলির মা।'

'না মা, তাই বলছিনু—' সন্ত্রস্ত হয়ে চঞ্চলির মা উঠে পড়ল।

দোরের কাছে সুহাসিনী এসে দাঁড়িয়েছেন!

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চঞ্চলির মার দিকে চেয়ে কঠোর স্বরে সুহাসিনী বললেন,—'ফলগুলো ছাড়ানো হয়ে গেছে—?'

'না মা। এই যে—যাই।' অস্ফুটস্বরে কথাগুলো বলে চঞ্চলির মা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

সবিদ্রূপহাস্যে সুহাসিনী বললেন,—'কমলদির সঙ্গীটা হয়েছে বেশ!'

বিবর্ণমুখে সুহাসিনীর দিকে চাইলেন কমলা।

ঈষৎ তিক্ত হাসি তাঁরও মুখে ফুটে উঠল। বললেন,—'গরীবের সঙ্গী ত' গরীবই হয় বৌ!'

আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন কমলা নিজের শ্লেষ-তিক্ত কণ্ঠস্বরে। তাহলে তিনিও আঘাত করতে জানেন!

কমলার মুখের দিকে বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সুহাসিনী; তারপর শ্লেষের হাসি হেসে শুধু বললেন,—'তাই নাকি? তা ভাল।'

কমলার ঘর থেকে তিনি চলে গেলেন।

চঙ্কলির মার ওপর তর্জ্জন গর্জ্জন কমলার কানে এসে পৌছতে লাগল; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না কমলা। ব্যথিত-বিহ্বল মুখে তিনি বসে রইলেন।

অসহ্য!

এর পরে আর একদিনও এখানে বাস করা সম্ভব নয়। উচিতও নয়,—সম্ভ্রম থাকবে না তাহলে!

কিন্তু ঝুমি—?

তার ললাটের নীল স্ফীত শিরাগুলি কোমল মাংসের আস্তরণে সবে ঢাকা পড়েছে। মোমের মত সাদা কপোল সবে রঙের আভায় গোলাপী হ'য়ে উঠেছে।

চোখের ঢুলু ঢুলু ক্লান্তির ভাব দেখে মনে হত বুঝি সুদূরের ডাক শুনতে পেয়েছে ঝুমি,—এত স্বপ্নময় অবাস্তব সে দৃষ্টি যে অজানা এক আশঙ্কায় কমলা শিউরে উঠেছেন।

এখন আবার নীলার মত করুণ-কোমল চোখে হীরার ঔজ্জ্বল্য ফিরে এসেছে,—তার সঙ্গে কমলার শান্তি-সুখও ফিরে এসেছে আবার।

তাকে এরই মধ্যে নিয়ে যাবেন সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে? শু তুচ্ছ তাঁর আত্মসম্মানের মোহে? দোষ ত' কমলারও কম নয়! অত বাঁকাভাবে কথাটি না বললেই কি চলছিলনা?

কি প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলেন সেকি কমলা এরই মধ্যেই ভুলে গেলেন নাকি?

ঝুমির স্বাস্থ্যের চেয়ে কি তাঁর আত্মসম্মান বেশী? না,—সাবধানে থাকবেন কমলা।

ভাই-বৌয়ের বিরাগ যাতে আর না বাড়ে।

সহই করবেন তিনি।

মনে পড়ল শিশু-পুত্র উজলের মুখ। কোমল স্বকুমার শিশুর সেই তিনমাসের ছোট্ট বোনটিকে আদর করা 'দেখ মা—বোনটি ঠিক যেন লাল-টুকটুকে একটা ঝুম্‌ঝুমি!'

তারই দেওয়া 'ঝুম্‌ঝুমি' নামটা ক্রমে ছোট্ট হ'য়ে 'ঝুমি' হয়েছে। এই নামটির ভেতরই খোকা তাঁদের বেঁচে আছে।

দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল কমলার।

আত্মসম্মান এত বড় জিনিষ নয় যা সন্তানের জন্যে বিসর্জ্জন দেওয়া না যায়।

কিন্তু একটি ঘটনায় তাঁর সঙ্কল্প ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেল। যে সঙ্কীর্ণ গলির আলোবাতাসহীন গৃহে ঝুমিকে নিয়ে যেতে হবে ভেবে সব সহ্য করবেন ভেবেছিলেন কমলা, সেই বাড়ীতে ফিরে এসে মা আর মেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

সাগর-স্বপ্ন তাদের চোখ থেকে মিলিয়ে গেল! দেখতে দেখতে কেমন করে নীল সমুদ্র যেন নীলকণ্ঠের গরলের মতই ভয়াবহ হ'য়ে উঠল।

তার বিষাক্ত বাষ্পে যেন তাঁদের নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছিল !

মনে হতে লাগল এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন ! চারখানা দেওয়ালের ভেতর যে এত শান্তি এত মুক্তিও থাকতে পারে,—এর আগে কি কমলা একবারও অনুভব করেছিলেন ?

সহজভাবেই সব কিছু মানিয়ে নেবেন ভেবেছিলেন কমলা; তত সহজ কিন্তু তাঁর মনে হল না।

পরদিন শুভেন্দুর অন্ধকার মুখ দেখেই তাঁর সব উৎসাহ দপ্ করে নিভে গেল।

লজ্জায় মরমে মরে গেলেন তিনি। ছিঃ—ছিঃ—কি ভাবছে তাঁকে ইন্দু ?

না জানি কথাটা কত বিকৃত-ভাবেই না তার কানে উঠেছে !

সুহাসিনী সকালে যেখানে চা করছিলেন কুণ্ঠিতভাবে কমলা সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালেন।

অন্যদিন ভাই-বোনে সেই সময়ই দু'চারটি কথা হয়, আজ শুভেন্দু কোন কথাই বললেন না।

সুহাসিনী এক তরফাই বাপের বাড়ীর ঐশ্বর্য্য থেকে আরম্ভ করে আধুনিক সিনেমা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে অনর্গল সমালোচনা করেন, কমলা ঈষৎ হেসে শুনে যান। আজ তিনিও নীরব।

ডলি শুধু খেতে খেতে হাসিমুখে বলে উঠল 'কই পিসীমা তুমি খাও ? ঝুমি এল না যে ?' হঠাৎ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন শুভেন্দু। 'ডলি তোমায় ফোঁপর দালালি করতে হবে না। নিজের খাওয়া হ'য়ে থাকে উঠে পড়গে—যাও।' ডলির সঙ্গে সঙ্গে কমলাও চমকে উঠলেন। বিবর্ণমুখে শুভেন্দুর দিকে চাইলেন।

শুভেন্দুও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁরই দিকে চেয়েছিলেন। চোখে মুখে তাঁর তীব্র ঘৃণা!

কমলা তাঁর দিকে চাইতেই, তিনি কাগজে মন দিলেন।

চাইবনা মনে করেও কমলার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সুহাসিনীর মুখের দিকে।

নত মুখে চায়ের পেয়ালায় চামচ দিয়ে তিনি নাড়ছেন। চাপা-হাসিতে তাঁর মুখ রক্তিম।

নত মুখে কমলা নিজের ঘরে এসে বসলেন।

খানিক পরে চঞ্চলির মা তাঁর আর ঝুমির খাবার দিয়ে ত্রস্ত হয়ে চলে গেল।

কতক্ষণ বসেই রইলেন কমলা, মেয়ের ডাকে তাঁর চমক ভাঙ্গল।

খাবার কাছে এসে বসলেন কমলা।

কিন্তু অপমানের ব্যথায় বুক থেকে কণ্ঠ পর্য্যন্ত তাঁর বুজিয়ে দিয়েছিল। খাবেন মনে করেও কিছুই খেতে পারলেন না।

অতি কষ্টে এক কাপ চা কোন রকমে গিলে উঠে পড়লেন।

ঝুমির প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না কমলা। হয়ত শুনতেই পেলেন না।

বিবর্ণ মুখে পাথরের মত অনড় হয়ে তিনি বসে রইলেন।

চঞ্চলির মা বাসন নিতে এসে অবাক হয়ে গেল, কিন্তু কমলার মুখের দিকে চেয়ে কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না।

দ্বিপ্রহরে আহারাদি নির্ব্বিঘ্নেই শেষ হল।

সুহাসিনীর পাশে বসেই তিনি খেলেন,—কিন্তু একটিও বাক্য বিনিময় হলনা তাঁদের।

শুধু ঝুমির আনন্দের কোনই কমতি দেখা গেল না। চঞ্চলির সঙ্গে সেদিন দুপুরে আর ঝিনুক কুড়তে না গিয়ে ঘরেই তারা খেলবার এক নতুন পন্থা আবিষ্কার করে বসল।

সকলে যখন বিশ্রামের জন্যে নিজের নিজের ঘরে ঢুকলেন, তখন চঞ্চলি ও ঝুমি পরমোৎসাহে তাদের কাজে লাগল।

বাইরের দালানের একটা তক্তাপোষের তলায়, ডলির বাতিল করা ভাঙ্গা খেলনা গুলো ধূলি ধূসরিত হয়ে পড়েছিল।

চঞ্চলি সোৎসাহে সেগুলো ধুয়ে ঝুমির হাতে এনে দিতে লাগল আর ঝুমি খেলাঘর সাজাতে লাগল। তার মধ্যে একটা হাত-ভাঙ্গা পুতুলকে ডলি কাপড় পরিয়ে 'বর' আর পা ভাঙ্গা ডলিকে 'কনে' সাজিয়ে যখন তারা বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে—তখন চুপি চুপি ডলি এসে জানালায় বসল।

এই সময় ঘরের মধ্যে তারা রকমারী ফল খায়।

এক থোকা আঙ্গুর নিয়ে নিজেদের ঘরের ভেতর দিকের জানালায় বসে ডলি করুণ লুব্ধ চোখে তাদের খেলার দিকে চাইল।

চঞ্চলি লুব্ধ চোখে একবার ডলির দিকে চেয়ে ঝুমিকে চুপি চুপি বলল,—'কি সুন্দর আঙ্গুর গুলো দেখেছো? দিদিমণি? রসে একেবারে টস্ টস্ করছে!' বলতে বলতেই এক ফোঁটা জল তার জিভ থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ল।

চট্ করে মুখটা মুছে নিয়ে লজ্জার হাসি হাসল চঞ্চলি। ঝুমিও হাসল,—তারপর পুতুলের বিয়ের ভোজের জন্যে আনা লজেন্স থেকে একটা বার করে চঞ্চলিকে দিল। নিজেও একটা গালে ফেলে ফিস্ ফিস্ করে বলল,—'তোর বুঝি বড্ড লোভ হয়রে চঞ্চলি? সত্যি

ভাই আমারও খুব লোভ হয় ;—কিন্তু ওখানে বাবা যখন আমার জন্যে রোজ নিয়ে আসতেন, এত খারাপ লাগত!—তোকে কলকাতায় নিয়ে ঠিক আঙ্গুর খাওয়াব,—দেখিস!'

চঞ্চলি সাগ্রহে বলল,—সত্যি, আমায় কলকেতায় নিয়ে যাবে দিদিমণি?' উৎসাহে তার শান্ত চোখ দুটি ঝক্ ঝকে হয়ে উঠল।

খড়ি গোলার আল্পনা দিতে দিতে দৃঢ় স্বরে ঝুমি বলল,—'তোকে না নিয়ে আমি যাবইনা,—দেখিস!'

ডলির আঙ্গুর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, সে বলল,—'কি করছিস রে তোরা?'

ঝুমি সোৎসাহে বলল,—'এই আমার ছেলের সঙ্গে চঞ্চলির মেয়ের বিয়ে হবে কিনা? তাই আল্পনা দিচ্ছি। তুইও আয়না ডলি।'

ছল ছল চোখে ঘাড় নেড়ে ডলি জানাল সে যেতে পারবেনা।

ঝুমি উঠে এসে তার কাছে দাঁড়াল। অনুনয় করে বলল, 'আয় না ডলি। আমরা ত' আর বাইরে যাইনি ঘরেই ত' খেলছি।—আয় না ভাই?'

শুভেন্দু মেয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মুখ অন্ধকার। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করেই ডলি সাগ্রহে জিগ্যেস করল—'যাব বাবা?'

বিরস স্বরে শুভেন্দু বললেন,—'না।'

আব্দারের ভঙ্গীতে ঘাড় দুলিয়ে ঝুমি বলল,—'আসুক না মামাবাবু আমরা ত' ঘরেই খেলছি। কোথাও যাইনি ত'?'

'না—না—না। তুমি ছোটলোকের সঙ্গে খেলছ তাই খেল; ও যাবে না।'

অসমসাহস বলতে হবে ঝুমির,—অথবা আট বছরের মেয়ের কতটুকুই বা জ্ঞান থাকে? ছোট থেকে মা-বাপের কাছে সে আব্দারই করে এসেছে। তাই শুভেন্দুর অন্ধকার মুখের দিকে চেয়েও অবাক হয়ে শুধু সে বলল,—'বারে! ছোটলোক আবার কোথায়? ও-ত' চঞ্চলি!'

মেয়ের কান ধরে নাড়া দিয়ে ও ঝুমিকে ধমকে উঠলেন শুভেন্দু—'চোপ্‌রও জ্যাঠামেয়ে! নিজে উচ্ছন্ন যাচ্ছ তাই যাও। তোমারই যোগ্য চঞ্চলি;—ডলির নয়।'

ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠেছিল শুভেন্দুর মুখ। ডলির কান্নার সঙ্গে সঙ্গেই ঝুমিও ভীষণভাবে চমকে উঠল।

গোলমাল শুনে কমলা উঠে এসেছিলেন।

ফ্যাল ফ্যাল করে ঝুমি শুভেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; মুখ থেকে তার সব রক্ত সরে গেছে।

লাল দুটি ঠোট নীল হয়ে উঠেছে ভয়ে, কচি কিশলয়ের মত ঠোঁট কাঁপছে তার।

দুহাতে মেয়েকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলেন কমলা।

চঞ্চলির মা আর চঞ্চলি ভীত বিবর্ণ হয়ে মহা-অপরাধীর মতই থামের সঙ্গে মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শুভেন্দু বিষদৃষ্টিতে একবার সেই দিকে চেয়ে ক্রন্দনরতা মেয়েকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে গেলেন।

বড় রাস্তার ওপর ছোট্ট একটুকরো ফ্ল্যাটের একটি জানালার কোণ। রোগশয্যায় শায়িত রুগীর পক্ষে এটা কি কম বিরক্তিকর?

দিনের পর দিন বিছানায় পড়ে থেকে থেকে, কলকাতা সহরের ট্রাম-বাসের শব্দমুখরিত রাস্তার ধারের জানালা দিয়ে একটুকরো একঘেয়ে আকাশের দিকে প্রতিদিন চেয়ে থাকা,—চঞ্চল একটি ছেলের পক্ষে,—কত যে কষ্টকর—সেকি তার দিদি নীরা একবারও ভেবে দেখেছে? বিছানায় শুয়ে সেই কথাই ভাবে বিকাশ—আর তার চোখ জলে ভরে আসে।

না—আকাশটা একঘেয়ে নয়—সেটা রাগ করে বলেছে। নীল আকাশটুকু ভাগ্যিস আছে—! আকাশের মেঘ, আকাশের তারা—আকাশের সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের বর্ণ-বৈচিত্র্য—তার জীবনেও খানিক বৈচিত্র্য এনে দেয় বৈকি! নাহলে কী করেই যে দিন কাটাতো!

বেশী ভাবতে পর্য্যন্ত পারে না আজকাল।

একটা কথা ভাবতে গেলেই—যত রাজ্যের বাজে কথা এসে ভীড় করে সামনে দাঁড়ায়,—দিশেহারা হয়ে যায় বিকাশ। চিন্তার কোন খেই খুঁজে পায়না আর। ভাগ্যিস এই জানালাটুকু আছে—আর আছে—হাতছানি দেওয়া, মন কেড়ে নেওয়া ঐ আকাশটুকু! নাহলে বিকাশ বোধহয় পাগল হ'য়ে যেত!

চোখ বুজে বিকাশ মার মুখ মনে আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু মার সুস্থ অবস্থার স্নেহ-কোমল মুখখানি কিছুতেই মনে পড়ে না।—তার জায়গায় ভেসে ওঠে অকালবার্দ্ধক্যে শীর্ণ রুক্ষ একখানি মুখের ছবি! আহা! কী ভোগাই না মা ভুগেছিলেন!

রোগশয্যায় শুয়ে তাঁর সেই অসহায় কাতরানির কথা মনে হলেই বিকাশের ভয়ে গা ছম ছম করে! শেষকালে কি ওরও সেই দশাই হবে নাকি?

দূর! তা হবে কেন!

কি যে আবোল-তাবোল ভাবনা আসে! শীর্ণ হাত দিয়ে বিকাশ তার চোখের জল মুছে ফেলল তাড়াতাড়ি।

নিজের ললাটে বুকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে আশ্বস্ত হল। জ্বর ত' কালই ছেড়ে গেছে।

কাল ভাত খেতে পাবে ডাক্তারবাবু বলেছেন।

আর ক'দিনই বা! তারপরেই স্কুল,—খেলা—বাইরের বন্ধুবান্ধব।

কে আর তখন সাধতে যাবে স্কুল কামাই করে একটি দিনের জন্যে তার কাছে থাকবার জন্যে!

বাড়ীতে একটা না-পড়া গল্পর বই পর্য্যন্ত নেই। আর বই পড়বার মত আগ্রহ বা শক্তিই কি আছে বিকাশের!

তাই না অত করে সেধেছিল—?

সিঁড়িতে কার ক্লান্ত পদধ্বনি শোনা গেল।

বিকাশ উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল।

দরজায় কার ছায়া পড়ামাত্র সে জানলার দিকে মুখ করে চুপ করে শুয়ে রইল।

ঘরে ঢুকল বাইশ তেইশ বছরের একটি তরুণী।

শ্যামলা রং। সুশ্রী মুখখানি। চোখের তলায় তার জীবন-যুদ্ধের শ্রান্তির কালিমা। সুকুমার মুখ ছোট্ট হাল্কা গড়ন দেখলে বয়সের চেয়ে আরও ছোট দেখায়।

অসহায় করুণ ক্লান্ত একটা ছায়া মুখখানাকে আরও কোমল করে তুলেছে। টুকটুকে লাল ছিটের ব্লাউসের সঙ্গে মিলের লাল পাড় সাড়ীই সুন্দর ও শোভনভাবে পড়েছে।

দেখলেই মনে হয় জীবন-যুদ্ধে নিপীড়িত হলেও মনের কোণে কিছু সখ তার এখনও অবশিষ্ট আছে।

মেয়েটি ঘরে ঢুকেই জানলার দিকে তাকাল।

ভ্রূর ওপর কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল তার: কিন্তু কিছু না বলে, গামছা, সাবান, শাড়ী নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

শ্রান্ত—বড় পরিশ্রান্ত নীরা!

দিনের পর দিন স্কুল-মাস্টারী করে এসে একটুও আর শক্তি অবশিষ্ট থাকে না তার দেহে।

এইত তার তেইশ বছর মোটে বয়েস,—এরি মধ্যে রাজ্যের অবসাদ যেন এসে তাকে গ্রাস করেছে!

কোন উৎসাহ নেই, কোন উদ্দীপনা নেই,—মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো যেন ভোঁতা হয়ে গেছে!

নাহ'লে রোগা ভাইকে কোন সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না করে কি নিজের প্রয়োজন সারতে আসে?

প্রয়োজনের একটা যন্ত্রে পরিণত হয়েছে নীরা।

আজ সামান্য একটি আব্দার করেছিল বিকাশ, তাও রাখতে পারেনি। না রেখে অবশ্য ভালই করেছে।

বিকাশের অসুখের জন্যে এই ক'দিন কামাই হওয়াতেই হেড্-মিস্ট্রেস কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন।

দুরু দুরু বুকে তাঁর শ্যেন দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হয়েছে নীরার।

বড্ড অসাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে—ভীতও হয়েছে।

চাকরীর বাজার আজকাল ভয়ানক খারাপ। অল্পবয়স্কা শিক্ষয়িত্রী-

দের ওপর প্রৌঢ়া প্রধানা শিক্ষয়িত্রী অত্যন্ত চটা। মনে করেন তাদের দিয়ে কোন কাজ হয়না। তাঁর বিশ্বাস—থাকবার জন্যে তারা আসেও না।

কিছুদিন সখের খেয়ালে চাকরী করে—বিয়ে করে চলে যায়। আর রেখে যায় একটা অপরিসীম বিশৃঙ্খলা!

এই বাজারে চাকরী গেলে—নীরা তার ভাইকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে ভাবতেও তার ভয় করে।

বি. এ. বি. টি. পাশ করেই ভাগ্যিস চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিল নাহলে কি যে হত আজ!

মা ছিলেন নার্স। এই ফ্ল্যাটটুকু তাঁরই এক দূর সম্পর্কের বোনের কাছে সস্তায় ভাড়া নিয়েছিলেন। তখন নীরারা জন্মায়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহু আগের কথা সেটা। তারপর কত কি ঘটে গেছে! বাড়ী ভাড়া বেড়েছে, সেলামীর সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু নীরারা সেই ভাড়াতেই আজও বাস করতে পারছে।

তবু মাসীমা সন্তোষিনী ভাড়া না বাড়ালেও তাঁর অসন্তোষের ভয়ে নীরা তাঁর নাতনীকে বিনা মাইনেতে পড়িয়ে দিয়ে আসছে।

নীরার বাবা ছিলেন কেরানী। তিনিই স্ত্রীকে পাশকরা নার্স করেছিলেন—দুজনের রোজগারে অর্থের সচ্ছলতা আসবে বলে।

কিছুদিন তাঁদের জীবনে সচ্ছলতা এসেওছিল। কিন্তু বিকাশ যখন তিন বছরের শিশু তখনই নীরার বাবা মারা গেলেন। মা শোক করবারও অবকাশ পেলেন না। কখনও নাইট ডিউটি কখনও দিনে ডিউটি করে ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে লাগলেন।

মনে পড়ে নীরার—যে দিনগুলো মা কাজ পেতেন না সেই ক'টা দিনই ছিল তাদের পরম সম্পদ।

কী উৎফুল্লই না হ'য়ে উঠত ওরা মাকে কাছে পেয়ে! আর মা?

তাঁর স্নেহকরুণ প্রসন্ন মুখেই সেকথা লেখা ছিল, তবু ভাবনার কুয়াসা-মেঘে ঢাকা চাঁদের মত তাঁর মুখ মলিন করে তুলত। ভাবনা ত তাঁর কম নয়। মা হয়েও যে বাপের কাজ তাঁকেই করতে হ'ত। তাই কাজ না পেলে উদ্বেগ তাঁর ক্রমশঃ বাড়তেই থাকত—কেমন করে চালাবেন সংসার? মাসকাবারে বাড়ীভাড়া—গোয়ালার টাকা—ছেলে-মেয়ের স্কুল-কলেজের মাইনে কেমন করে আসবে?

তাই অবসাদে শরীর তাঁর ভেঙ্গে পড়লেও, বাড়ী বসে থাকবার কথা কল্পনাও তিনি করতে পারতেন না।

আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন সরোজিনী স্বামীর দূরদর্শিতা দেখে! শ্রদ্ধায় তাঁর সারা মন আনত হয়ে পড়ত।

আজ যদি তিনি নার্স না হতেন কি হ'ত! কি হ'ত ভাবতেও তাঁর সর্ব্বাঙ্গ হিম হয়ে আসত—বিরাট একটা কালো গহ্বর ছাড়া আর কিছু তিনি দেখতে পেতেন না।

অর্থ-ই অনর্থের মূল—একথা ভাবলেও হাসি পেত সরোজিনীর।

কে জানে এক সময় হয়ত একথা সত্য ছিল,—যখন মানুষ শুধু মনুষ্যত্বকেই পূজো করত, যখন ভগবানের দেওয়া ফলমূল মানুষ বিনা অর্থেই প্রচুর পরিমাণে ভোগ করতে পারত। যখন সত্যি সত্যিই সুজলা সুফলা ছিল দেশ—মানুষের মনেও ছিল সহজাত দয়া ও ভালবাসা। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে এই কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগে অর্থহীন জীবন অনর্থ নিয়ে আসে।

অর্থ এখানে প্রতিপদেই আবশ্যক,—সে অনর্থ নয়,—সে দেবতার মঙ্গলাশীষ। দারিদ্র্য এ যুগে পাপ,—তার জন্যে আজ অহঙ্কার করা

যায় না—। সে মেরুদণ্ড আজকের সমাজে আর কারুর নেই। বিলাসিতা—বিলাসিতা—চারিদিকে অবাধ বিলাসিতার স্রোত! কুটোর মত নরনারী তাতে ভেসে চলেছে—। বিত্তহীন মধ্যবিত্ত সমাজেও সে ঢেউ এসে লাগছে বৈকি! কিন্তু তাতে অসন্তুষ্টিই বাড়ছে আর কোন লাভ হচ্ছে না।

তারা ডুবছে—বিলাসিতার জন্য নয়,—শুধু অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য—মাথা গোঁজবার এক টুকরো ছাদের জন্যে, পাপের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে!

শুধু অর্থ নেই বলেই—; জীবনধারনের আর কোন পন্থা নেই বলেই—আর কিছুর জন্যেই নয়।

নার্সের কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা ত' আর কম হয়নি সরোজিনীর।

তাই প্রাণপণে খেটে যতটুকু পারতেন ভবিষ্যতের জন্যে তিনি সঞ্চয় করতেন।

কিন্তু কতটুকুই বা সামর্থ্য ছিল তাঁর?

নীরাকে তাই ডাক্তার করতে ভারী ইচ্ছে ছিল, কিন্তু নীরার অনিচ্ছার জন্যে সেটা আর হ'য়ে ওঠেনি।

মেয়ের ইচ্ছায় তিনি বাধাও দেননি।

হাসপাতালের সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝেছিলেন,—অর্থ থাকলেও এপথে ভারী খাটুনী।

ঐ রোগা মেয়ে তাঁর,—নানা রোগের ভীড়ে এসে তার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও ছিল।

তবু দিন ত তাঁদের চলে যাচ্ছিল। ধনীর দিনের মত সাবলীল

ছন্দে না চললেও—সংসারের চাকা চলছিল ঠিকই,—তেলও তখন পড়ত তাতে তাই চাকার কর্কশ আওয়াজ কানে আসত না।

কিন্তু অদৃষ্ট বিরূপ!

নির্মেঘ নীল আকাশে কোথা হতে মেঘ জমতে সুরু হল,—সরোজিনী অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

নিজে নার্স হয়েও তিনি বিশ্রাম নিলেন না,—এমনকি—পুত্র-কন্যার কাছেও রোগ লুকাতে লাগলেন। পাছে কাজ করতে ওরা না দেয়!

শেষে যখন অশক্ত হ'য়ে বিছানায় শুলেন তখন রোগ চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে! তবু সরোজিনী হাসপাতালে চাকরী করতেন বলেই অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন নাহলে মধ্যবিত্ত ঘরে এই রাজকীয় ব্যাধির চিকিৎসা হওয়া অসাধ্য।

সকলে সেবাসদনে ভর্ত্তি হতে বললেও যতদিন পেরেছিলেন তিনি বাড়ীতেই ছেলেমেয়ের কাছে ছিলেন।

সেই সময় দেবতার করুণার মতই করুণ এসেছিল।

মেডিকেল কলেজের চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র করুণ বোস।

ডাক্তারের সম্বন্ধে যে ভীতি ও সম্ভ্রমবোধ থাকে নার্সদের—সরোজিনীরও তার চেয়ে কিছু কম ছিল না।

কিন্তু অযাচিতই এসেছিল করুণ,—সমস্ত সঙ্কোচ তাঁর হাসির ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিল।

নিয়মিত দুবেলা সে সরোজিনীকে দেখে যেত।

সে-ই তদ্বির করে সেবাসদনে ফ্রী-বেডে তাঁকে ভর্ত্তি করে দিয়েছিল। তারপর অসহায় দুটি ভাই-বোনকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেওয়া—খোঁজ-

খবর নেওয়া এমনভাবে করত যে মনেই হোতো না করুণ তাদের কেউ নয়।

দুর্দ্দিনের বন্ধু করুণ। তার কাছে ঋনের বোঝা দিন দিন ভারীই হয়ে উঠছে নীরার।

কে জানে এখন হয়ত শোধ করা কঠিন নয় নীরার পক্ষে। নীরার পাণ্ডুর কপোলে একটু রক্তের ছোপ লাগল।

ষ্টোভটা ধরিয়ে চায়ের জল চপিয়ে নীরা এসে এতক্ষণে রোগা ভাইয়ের পাশে বসল।

'বিকাশ, আজ এখনও কিছু খাসনি বোধ হয় তুই—নারে—?'

দিদির প্রশ্নের উত্তরে বিকাশ ঘাড় নেড়ে জানাল—'না'।

তার চোখ জলে ভরে উঠল,—চোখের জল লুকোবার জন্যে সে নত মুখে বসে রইল।

দিদি কি বুঝতে পারেনা—নিজে হাতে কিছু করে খাবার সামর্থ্য বিকাশের এখনও হয়নি!

নীরা চা করে এনে বিকাশকে চা'র সঙ্গে খানকতক বিস্কুট দিয়ে,—নিজে শুধু চায়ের কাপটা মুখে তুলল। বিকাশ বলল,—'বাঃ! তুমি বুঝি আজ আর কিছু খাবে না দিদি—?'

'এইত' বিকুর রাগ পড়েছে।' হেসে উঠল নীরা।

'সকাল সকাল আজ ঝোল-রুটি করব তোর জন্যে, সেই দুজনে খাব। তাই আর খাচ্ছি না।'

সকালে দিদি কত যে খাবে তা বিকাশের খুব জানা আছে।

চারতলার মাসীমার নাতনী রান্না শেষ হলেই পড়তে আসবে, পড়িয়ে উঠতে উঠতেই আটটা সাড়ে আটটা,—তারপর যদি অবসর হয়!

বিস্কুটের টিন ঝেড়ে বিকাশকেই সব দিয়েছে নীরা। এত ক্ষিদে তার আজকাল পায়—ও-কটা বিস্কুট তার পক্ষে কিছুই নয়, কিন্তু দিদির শুকনো মুখের দিকে চেয়ে ভারী মন কেমন করে বিকাশের।

সে বলল,—'না দিদি, আমার থেকে দুখানা তুমি নাও—আমার নাহলে ক্ষিদে হবেনা।'

দুজনেই দুজনকে ভোলাবার চেষ্টা করে।

নীরা আর কিছু বলল না, ম্লান হেসে বিকাশের প্লেট থেকে একটা বিস্কুট তুলে নিল।

রাঁধতে রাঁধতে নীরা ভাবে।

একি অনির্দ্দিষ্ট অনিশ্চিত জীবনযাপন তার!

কতদিন নীরা স্বপ্ন দেখেছে একটি স্নিগ্ধ শান্ত গৃহকোণের ছবি। করুণকে দেখে মনে হয়েছে হয়ত তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ ধরবে। তার অনাবিল কুমারী-হৃদয়ের সাধনা যেন মূর্ত্তি ধরে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রূপকথার রাজকুমার করুণ!

কবে একদিন তার বিহ্বল হৃদয় হারিয়ে ফেলেছে নীরা জানে না,—কিন্তু কই করুণের মন ত আজও জানতে পারেনি!

আজও করুণ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতেই পড়ে।

দু'বছর ধরে তার সঙ্গে মিশছে নীরা—কিন্তু আজও কেন বুঝে উঠতে পারেনা—করুণের এটা সহৃদয় বন্ধুত্ব না ভালবাসা?

'তোর লজ্জাও করে না রে?'

'কেন, করেছি কী?' বিস্মিত বোন ভাইকে প্রশ্ন করল।

বিরক্তিতে ভ্রূ-কুঁচকে অমিতাভ বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল—'এটুকু বোঝবার বুদ্ধি পর্য্যন্ত তোর নেই,—তবু কলেজেও তুই কিছুদিন পড়েছিলি !—'

'জানিনা বাবা!' রাঙা মুখ রাঙা করে মল্লিকা বললে,—'হেঁয়ালী করে কথা বললে বুঝবো কেমন করে শুনি? কলেজে ইস্কুলে কি আর আমি পড়েছি—সে ত সাজসজ্জা দেখাতে গেছি শুধু!'

বোনের অভিমানভরা মুখের দিকে সকৌতুকে চেয়ে অমিতাভ বলল,—তা মিথ্যে বলিসনি মল্লি—নাহলে নিজে একজন শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে কি বলে তুই রোজ রোজ মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছিস বলত?'

'—বারে আমাদের মোটে একটি ভাইয়ের যে বৌ হবে তাকে দেখে নিতে হবে না—যদি কানা-খোঁড়া হয়?'

একটু দুষ্টু হাসি হেসে মল্লিকা আবার বলল,—'ও! তোমার বোধ হয় নিজে দেখে বিয়ে করবার ইচ্ছে দাদা,—না? তা' পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ কেন,—মুখ ফুটে বললেই ত' সব ব্যবস্থা হয়।'

'যা—যা—বাজে ইয়ারকি করতে হবেনা।' ধমকাতে গিয়েও অমিতাভ হেসে ফেলল।

তুই সেদিনের একফোঁটা মেয়ে,—তুই কি বলে পাকা গিন্নীর মত মেয়ে দেখতে যাস বল দেখি?

এই ত' সেদিন তোর বিয়ে হল;—তোকে দেখতে আসার কথাগুলো মনে পড়ে না বুঝি?'

মুখ ভার করে মল্লিকা বলল,—'মনে পড়ে না আবার? খুব মনে পড়ে। তবে বাবা বলেছিলেন কিনা মেয়ে দেখতে গেলে ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে মেয়ে পছন্দ না করে আসতেই পারবেন না,—আর মা

যে যেতেই চান না—অথচ বৌ তাড়াতাড়ি আনতে চান,—তাই না আমায় যেতে হয়? বেশ আর যাব না। বাবা যার বাড়ী যাবেন মেয়ে পছন্দ করে আসবেন,—বেশ হবে। কলিকালে কারুর ভাল করতে নেই!'

'সেই ভাল মল্লি,—অত ভাল করিস না। তোর মেয়ে পছন্দ করা দেখে আমার বিয়ে করার ইচ্ছে উপে গেছে!'

'বেশ। বিলেতে পড়তে যাওয়াও তাহলে বন্ধ তোমার।'

'ঈস্! যাওয়া আমার কে আটকাবে? স্কলারশিপ পাচ্ছি জানিস ত'? বিয়েটা কি টিকে নাকি—যে না নিলে বিলেত যাওয়া চলবে না?'

'টিকেই ত!' দুষ্টু-হাসি হেসে মল্লিকা বলল,—টিকে কেন রক্ষা-কবচ।—না বিয়ে করলে তোমায় বাবা-মা যেতে দিলেন কিনা?'

অমিতাভ হেসে ফেলল। বলল,—'হুঁ, বিয়ে হয়ে তোর অন্ততঃ খুবই উন্নতি হয়েছে দেখছি। যা আর বাজে বক্‌বক্ করে আমার দুপুরটি মাটি করিস না। বরং আশ মিটিয়ে মেয়ে দেখে বেড়া—যা পারিস।—সত্যি! মেয়েরা নিজেরা নিজেদের যা অপমান করে,—কোন পুরুষও বোধ হয় এতটা পারবে না!'

লজ্জার একটা ম্লানছায়া মল্লিকার প্রফুল্ল মুখখানাকে মলিন করে দিল। অমিতাভের কাছের একটা চেয়ারে বসে গাঢ়স্বরে বলল,—'সত্যি দাদা,—মেয়ে দেখা আমারও মোটেই ভাল লাগেনা ভাই;—কিন্তু আমাদের হিন্দুর ঘরে আর কি পথ আছে বলনা?'

'কি জানি ভাই কি পথ! উপস্থিত কিন্তু বড় বিপদগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছি আমি!'

'কিসের বিপদ অমিত?'

সহাস্যে শ্যামবর্ণ সুদর্শন সুবেশ যুবা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

মল্লিকা সোৎসাহে বলল,—'দেখ না করুণ দা'—দাদা বিয়েটাকে বিপদ বলছে—বিয়েটা কি বিপদ?'

'কি করে জানব ভাই!' হাত উল্টে হতাশ ভঙ্গীতে করুণ বলল,—'ও রসে বঞ্চিত আমি,—তবে তুই বরং বলতে পারিস—তোর ত' কিছু অভিজ্ঞতা আছে—কি বল অমিত?'

অমিতাভ মৃদু হাসল। ক্রোধরক্তিম মুখে মল্লিকা বলল,—'বাব্বা! কি বাজে ইয়ারকি করছ করুণদা'? ছোট বোনকে কেউ ওসব কথা বলে?'

কৃত্রিম কোপে অমিতাভ বলল,—'নাঃ—তোমার ভারী অন্যায় করুণ;—বাজে ইয়ারকি দেবার অধিকার একমাত্র ছোট বোনের আছে।—অনধিকার চর্চ্চা কোর না।'

বিস্ফারিত নেত্রে একবার দাদার দিকে দৃষ্টিপাত করে সক্রোধে ঘর ছেড়ে যেতে যেতে মল্লিকা বলে গেল,—'যাচ্ছি আমি মাকে বলতে,—দুজনেরই তুমি তাড়াতাড়ি বিয়ে দাও,—নাহলে ওরা 'বকে' যাবে!'

নিজের ঘরে এসেও দুজনের অট্টহাসির রোল মল্লিকার কানে এসে পৌছতে লাগল।

মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে পাশে পানের ডিবে নিয়ে বড় একটা গ্রন্থাবলী হাতে করেই বড় মধুর ঘুমটি এসেছিল হেমবরণী দেবীর। চমকে জেগে উঠলেন তিনি। উঠে বসে মেয়েকে জিগ্যেস করলেন,—'কি হয়েছে রে মল্লি?'

অবরুদ্ধস্বরে মল্লিকা বলল,—'জানিনা যাও। জিগ্যেস করগে না তোমার আল্লাদে গোপালদের?'

মল্লিকার দু'বছরের খোকা গোলমালে চমকে জেগে ওঠে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। মল্লিকা সজোরে ছেলের পিঠে এক চড় বসিয়ে দিয়ে ধমকে উঠল,—'এই আরেক উল্লুক উঠলেন জ্বালাতে!'

'কি যে করিস্ বাপু তোরা—' শান্ত হাসি হেসে নাতিকে কোলে তুলে নিলেন হেমবরণী।

'কথায় কথায় ছেলেকে মারিস কেন বল দেখি? ও বেচারী কি করল!'

'ও যে পুরুষমানুষ মা!' দরজায় অমিতাভের হাসিমুখ দেখা গেল।

মল্লি অনুযোগভরা দৃষ্টিতে চাইল মা'র দিকে।

মা বললেন,—'সত্যি খোকা! কেন লাগিস ওর সঙ্গে দিনরাত বলত'?—ভাইবোনে ঝগড়াটা কিসের?'

'মল্লিই বলুক না।' অমিতাভ মার পাশে বসে খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে বসল।

সক্রোধে খাটের ওপর উঠে বসল মল্লিকা।

'কেন আমি কি দোষ করেছি শুনি? জান মা—মেয়ে দেখতে যাই এই আমার দোষ—বেশ আর যাব না। বাবা একটা কেলেকিষ্টি বৌ নিয়ে আসবেন,—বেশ হবে।'

এতবড় বিভীষিকাতেও ভয় না পেয়ে মিটি-মিটি হেসে অমিতাভ বলল,—'মনে থাকে যেন!'

'দেখছ মা—'

হেমবরণী মৃদু হেসে ঝগড়াটার নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করেন,—'এত বড়টি হলি,—তবু তোদের খুনসুটি করা গেল না রে!'

খোকাকে মার কোলে তুলে দিয়ে তাঁর পাশে মাদুরে শুয়ে পড়ে

অমিতাভ বলল,—'কতদূরে চলে যাব—কতদিন আর মল্লির সঙ্গে ঝগড়া করাই হবে না—ওই মন কেমন করে মরবে!'

মা'র চোখের পাতা ভিজে উঠল। তার ঘন চুলের ভেতর আঙ্গুল চালাতে চালাতে তিনি বললেন,—'নাই-বা গেলি খোকা?'

'সেকি হয় মা? এখান থেকে স্কলারশিপ পাচ্ছি—মাইনিং ভাল করে শিখে আসতে পারলে—আমাদের কোলিয়ারী দেখাশোনার স্থবিধে হবে—। বাবা ত' রাজী হয়েছেন—তুমি আর বাধা দিওনা মা—লক্ষীটি!'

মা'র বিষাদম্লান মুখের দিকে চেয়ে অমিতাভ আবার বলল,—'আর তা'ছাড়া তোমার সর্ত্তেও আমি রাজী হয়েছি ত'?'

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে হেমবরণী বললেন,—'হুঁ।' দরজায় করুণের মুখ দেখা গেল—সে বলল,—'মাসীমা—একবার আমার ঘরে আসতে পারবে?'

'যাই বাবা।' হেমবরণী ত্রস্তে উঠে গেলেন।

মল্লিকা অমিতাভের দিকে চেয়ে হাসল। অমিতাভও হেসে বলল,—'হাসলি যে খামকা?'

মল্লিকা বলল,—'করুণদা' কক্ষনো আমাদের সামনে মা'র সঙ্গে কথা বলতে পারে না।—টাকা চাইতে আমাদের সামনে চক্ষুলজ্জা হয়, না কি?'

'তোর যত বাজে সন্দেহ—অন্য কথা কি থাকতে পারে না?'

ঠোঁট উল্টে মল্লিকা বলল,—'অন্য কথা না কচু! মা'র সঙ্গে টাকার কথা ছাড়া আর কিছুই কথা থাকে না। কত পোষাক-আসাক ওর,—অত সিনেমা দেখা—কোথা থেকে হয়—বলত? দেখো তুমি নতুন একটা দামী স্যুট এল বলে!'

হাসি চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করে অমিতাভ বলল,—'এত পরশ্রীকাতর তুই কেন বল দেখি?'

মা'র কোলে পরম আরামে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছিল—তাকে সন্তর্পণে বিছানায় শুইয়ে এসে সক্ষোভে মল্লিকা বসল,—'না দাদা,—সত্যি বলছি তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়—বিধাতা ভোগ করা তোমার কপালে লেখেন নি—না হ'লে এত থাকতেও তোমার এ বেশবাস কেন?' ভ্রূ-কুঁচকে সে দাদার আধময়লা জামা-কাপড়ের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করল।

সহাস্যে অমিতাভ বলল—'সেই জন্যেই ত' বিলেত যাচ্ছি রে—যখন ফিরব তখন একটি চালিয়াৎ-চন্দর হয়েই ফিরব। কোন আপশোষ করিস না।'

আপশোষ করতে মল্লিকার বয়ে গেছে! মুখে আপশোষ করে আর মনে মনে কি কম গর্বিত হ'য় ভাইয়ের জন্যে—?

লক্ষপতির একমাত্র ছেলে—দু-দুটো চালু কোলিয়ারীর মালিক—এমন প্রকাণ্ড বাগানওলা বাড়ী—গ্যারেজে দামী মোটরকার—এত দাসদাসী আশ্রিত পরিজন যে বাড়ীতে—কে বলবে অমিতাভের চালচলন পোষাক-পরিচ্ছদ দেখলে—সে এ বাড়ীরই ছেলে—?

মোটর ত' তাদের বাবা আরেকটা ছেলের জন্যেও নিয়েছিলেন কিন্তু সে না ব্যবহার করার জন্যেই অবশেষে বিক্রী করে দিতে হয়েছে।

তার বাবার দেওয়া গাড়ীতে চড়েই তার স্বামী সমর এখানে আসা-যাওয়া করে। গাড়ীটা যৌতুকে পেয়ে ডাক্তারীর তার কত সুবিধে হয়ে গেছে—সর্ব্বদা তার কাছে এই কথা শুনে শুনে গর্ব্বে বুক ভরে

মল্লিকার—আর তার শ্বশুরবাড়ীতে দেখা করতে অমিতাভ ট্রাম-বাস ছাড়া যায় না।

একশো টাকা মাসে মাসে পকেট-খরচের জন্যে যে পায় তাও যে কী করেই খরচ করে!

প্রায়ই জঞ্জালের মত পুরনো বই কিনে আনে!

বাকী টাকাটিও কিসে খরচ করে—এত দিনে অনেক গোয়েন্দাগিরি করে জানতে পেরেছে মল্লিকা।

বেশ মোটা টাকা সে স্োসালিষ্ট পার্টিকে চাঁদা দেয়। একেই বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরিয়ে বেড়ানো!

এমন সুপুরুষ তার দাদা—অথচ নিজের রূপ সম্বন্ধেও সে তেমনি উদাসীন!

মাথার চুলে ত' ছুটির দিনে চিরুণীই পড়ে না!

খামখেয়ালী এই ভাইটির ওপর কেমন একটা মমতায় মল্লিকার বুক ভরে ওঠে।

সেটা ছোটবোনের মত মোটেই নয়—বড় দিদিরই স্নেহের মত। মল্লিকার ভারী মায়া হয়—।

মা'র একমাত্র ছেলে সে—অথচ মানুষ-করা ছেলে করুণই বেশী আব্দার করে মার কাছে—। মল্লিকার রাগ হয় করুণের বেশী আদর দেখে—কিন্তু যার রাগ হবার কথা, হিংসে হ'বার কথা—তার কিছুই হয় না!

মেঝেয় মাদুরে বসে, নানা রকমের বিচিত্র বর্ণের সিল্ক-সাটিন-ছিট

ছড়িয়ে—ঝুমি নিবিষ্টমনে সেলাইয়ের কল চালিয়ে ফ্রক সেলাই করে যাচ্ছিল—।

ঝুমি আর সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই—। সে অষ্টাদশী তরুণী। বেথুন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী।

ছুটির দিন কলেজ বন্ধ।

ছুটির দিনগুলো ঝুমি পাড়ার মেয়েদের জামা সেলাই করে। পারিশ্রমিক নিয়েই করে অবশ্য।

চমৎকার তার কাটছাঁট-এর হাত। তার তৈরী জামা—যে কোন ফ্যাসানেব্‌ল্ বড় দোকানের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

তাই ঘরে বসেই সে অনেক কাজ পায়।

এই পয়সায় সে নিজের একটি সখ মেটায়। সপ্তাহে দু'দিন সে গানের স্কুলে সেতার শিখতে যায়।

মা-বাপের সে যদিও একমাত্র সন্তান—তবু গরীবের মেয়ে ত' তাঁরা হয়ত এ সখটুকু মেটাতে পারতেন—কিন্তু ঝুমি তাতে আপত্তি করে।

ঝুমি তাঁদের বুঝিয়েছে—তাদের মত গরীবের এ সখ সাজে না তবু সখ যদি মেটাতেই হয়—সে নিজের উপার্জ্জনের পয়সাতেই মেটাবে,—এতে তবু বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার দায় তার থাকবে না।

সোমদেববাবু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন—কিন্তু মেয়ের জন্যে গর্ব্বও অনুভব করেছেন। স্বাবলম্বন তিনি চিরকালই পছন্দ করেন তাই বাধাও তাকে দেননি।

মেয়ের এই সখের পয়সা যোগাতে গেলে তাঁকে নিজের একটি সামান্য সাধও বিসর্জ্জন দিতে হ'ত। চার পাঁচটি গরীব ছাত্রকে তিনি

অর্থ সাহায্য করেন।—সামান্যই অবশ্য—স্কুলের মাইনে আর মাসে মাসে কিছু পাঠ্য-পুস্তক কিনে দিতে হয় তাঁকে।

আর যেটুকু সাহায্য করেন—সেটুকু নিজের সামর্থ্য দিয়েই করেন—অর্থের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। রবিবারের সকালে তিনি তাদের পড়ান।

সেইদিন একটু বিশেষ জলযোগের বন্দোবস্ত করেন কমলা। তাঁর হাতের তৈরী খাবার খেয়ে শীর্ণ কিশোর ছাত্রগুলির মুখে যখন তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে তখন সকরুণ মমতায় কমলার বুক ভরে ওঠে।

কে জানে সবদিন তাদের পেটভরে আহার জোটে কি না!

বয়সের চেয়ে অনেক ছোট দেখায় তাদের—।

তাদের সামান্য একটু তৃপ্তি দিতে পেরেছেন বলে নিজেও বড় তৃপ্তি পান কমলা।

সোমদেববাবু নিজেকে খুব সুখী মনে করেন।

অর্থের প্রাচুর্য্য তাঁদের যেমন নেই,—তেমনি অসচ্ছলতাও আর নেই।

অনেকদিন বাড়ীতে কোন রোগ না হওয়ায় ক্রমশঃ তিনি সামলে উঠেছেন। কমলার গহনাগুলোকে ছাড়াতে পেরেছেন—এতেই তিনি তৃপ্ত।

সন্তানসন্ততি ভীড় করে এলে কি হ'ত অবশ্য বলা যায় না—তবে এ বিষয়েও তিনি ভাগ্যবান। একটিই সন্তান তাঁদের।

সকাল-সন্ধ্যে দু'টো টিউসনি করেন। স্কুলপাঠ্য বই লিখেও মাসে মাঝে মাঝে কিছু পান। তিনি মনে করেন—তিনি যথেষ্ট পাচ্ছেন—অভাববোধ তাঁর নেই—তাই কোন অভাবও আর নেই। ভগবানকে

তিনি অজস্র ধন্যবাদ দেন,—কমলার মত স্ত্রী দিয়েছেন বলে—ঝুমির মত মেয়ে দিয়েছেন বলে।

সচ্ছন্দ গতিতে জীবন যাত্রা চলে যায়। কিন্তু সঞ্চয় তিনি কিছুই করতে পারেন না। মাঝে মাঝে একটু ভাবনা যে না হয় তা নয়,—তবু সে ভাবনাকে তিনি আমল দিতে চান না।

সেলাই শেষ করে সব গুছিয়ে ঝুমি উঠে পড়তেই—একটি দশ এগারো বছরের মেয়ে এসে দাঁড়াল।

হাসিমুখে সে বলল,—'ঝুমিদি—আমার ফ্রকটা হ'য়ে গেছে ত'?'

'না ত'!' ঝুমি বলল,—'এখনও সেটায় হাতই দিইনি শান্তি।'

'বারে!' অনুযোগভরা স্বরে শান্তি বলল,—'আমি ক'দিন হ'ল দিয়ে গেছি তবু এখনও হ'ল না? এদিকে মায়ার জামা ত কালই করে দিয়েছ?'

ঝুমি ভ্রূ-কুঁচকে শান্তির দিকে চাইল,—তারপর মৃদু হেসে বলল,—'ওর যে একটাও জামা ছিল না,—আজ ও প্রাইজ আনতে যাবে না? তোর ত' অনেক আছে।'

উদ্ধতভাবে শান্তি বলল,—'থাকলেই বা! আমিই ত' আগে দিয়ে গেছি?'

ঝুমি বিনা বাক্যব্যয়ে বাক্স খুলে তার ফ্রকের সাটিনটা বার করছে দেখে শান্তির মুখ শুকিয়ে উঠল।

ঝুমিদিকে সে বিলক্ষণ চেনে। জামার ছিট ফিরিয়ে দেবে—আর কোনদিন সেলাই করতে নেবে না—কী ভীষণ বদরাগী যে ঝুমিদি!

'থাক—ঝুমিদি—থাক। পরেই করে দিও—' বলতে বলতেই শান্তি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঝুমি একটু হেসে সাটিনটা আবার বাক্সে তুলে রেখে কমলার কাছে রান্নাঘরে এসে বসল।

কড়া থেকে গরম নিমকিগুলো তুলতে তুলতে স্মিতমুখে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে কমলা বললেন,—

'কি হয়েছে রে ঝুমি—শান্তি অত দৌড়ে পালাল যে?'

'আমাকে যে ভয় করে মা ওরা—!' বলে ঝুমি হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল।

বাড়ী এসে রোষে ক্ষোভে শান্তিও মার কাছে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

অবাক হ'য়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে শান্তির মা বললেন 'আ গেল যা! হল কি তোর?'

কাঁদতে কাঁদতেই শান্তি বলল,—'জামাটায় ঝুমিদি এখনও হাতই দেয়নি,—মায়ার জামা এদিকে করে দিয়েছে, মায়া তবু সেলাইয়ের দামও দেয়না!'

খবর শুনে শান্তির মাও জ্বলে উঠলেন; অন্ধকার মুখে তিনি বললেন, —'ও মেয়ে ভারী দেমাকে। রূপের গরবেই মট্‌মট্ করছে সর্ব্বদা। বড়লোকের হিংসেতেই মরছে—ওকি কম? পয়সা দিয়ে জিনিষ করাব—কিসের খোসামোদ অত? যা ফিরিয়ে নিয়ে আয় কাপড়।'

চোখ মুছতে মুছতে ভীত হয়ে শান্তি বলল,—'না মা ফিরিয়ে আনতে হবে না। অমন সুন্দর ছাঁট কি এখানকার কোন দর্জ্জী পারবে?'

মুখ বিকৃত করে শান্তির মা বললেন,—'তা বটে—ঐ গরবেই ত ম'লেন মেয়ে!—থাক তবে।'

মনে মনে গুমরাতে থাকে শান্তি।

এত অদ্ভুত ঝুমিদি। যাদের পয়সা দেবার সামর্থ্য নেই,—তাদের

জামা যেচে করে দেবে—আর যারা বেশী পয়সা দেবে তাদেরই জামা করতে দেরী করবে।

মায়ার ওপর একটা বিজাতীয় হিংসেয় শান্তি জলতে থাকে।

ঝুমিদির কাছে গিয়ে মায়া পড়া পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে করে আসে। আর সে একদিন একটু পড়তে গিয়েছিল বলে ঝুমিদি কেমন অম্লানবদনে বলল,—কতকরে মাইনে দিবি আগে জেনে এসে বলিস—তারপর পড়তে আসিস। সেদিনের পড়াটা পর্য্যন্ত একটু দেখে দেয়নি। মা বলেন হিংসে—বড়লোকদের হিংসে করে তোর ঝুমিদি।

তাই হবে হয়ত—কিন্তু শান্তি আর তার মত আরো অনেক বড়লোকের মেয়েরা ঝুমিদির অদ্ভুত আকর্ষণের হাত হ'তে মুক্ত হ'তে পারে না।

শান্তির সুন্দর চেহারা—দামী গাড়ী থাকা সত্ত্বেও এবং বড় বাড়ীর মেয়ে হয়েও ঝুমিদির কোন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না—আর কালো, রোগা, ভীতু মারা তার ছেঁড়া জামা পরেও ঝুমিদির আপনার হ'য়ে ওঠে। লেখাপড়ায় ভাল বলেই কি? কিন্তু লেখাপড়া না-জানা কত গরীবের মেয়েও ত' ঝুমিদির আপনার বোনেরই মত। যত দোষ করেছে শুধু বড়লোকের মেয়েরা!

হিংসেয় শান্তির বুকের মধ্যে কেমন করে শুধু শুধু কান্না পায়!

মেয়ের কাছে সব শুনে কমলা কিন্তু হাসতে পারেন না। দুশ্চিন্তার কালোছায়া তাঁর সুন্দর মুখখানা মলিন করে দেয়,—তবু মেয়েকে কিছু জানতে দেন না।

খাবারের রেকাবী সাজিয়ে মেয়ের হাতে দিয়ে কমলা বললেন,—'বাইরের ঘরে ওদের দিয়ে আয় ত মা।'

ঝুমি খাবার নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে চলে গেল।

মেয়ের হাসিমুখে বিজয়িনীর মত দৃপ্ত-গমনের দিকে চেয়ে কমলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অন্যমনস্কের মত কমলা জ্বলন্ত উনুনটার দিকে চেয়ে রইলেন। দিন দিন ঝুমির যেন বড়লোকদের ওপর অহেতুক বিদ্বেষ বেড়েই যাচ্ছে!

কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছে সে।

ঘনপল্লবে ঘেরা হরিণের মত মায়াবী চোখ দুটি তার যখন শাণিত ইস্পাতের মতই ঘৃণায় ধারালো হয়ে উঠতে দেখেন,—রীতিমত ভীত হয়ে পড়েন কমলা। গোলাপের পাপড়ীর মত কোমল রাঙা ঠোঁট দুটিতেও যখন বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ হাসি দেখেন,—তখন কোন শান্তিই আর খুঁজে পান না কমলা। বড়লোক মাত্রই কি খারাপ লোক হয়—! মেয়ের মনের এ ভুল ধারণা কেমন করে ভাঙ্গা যায় কমলা ভেবে পান না।

রাত্রে স্বামীর কাছে নিজের আশঙ্কার কথা জানালেন কমলা।

সোমদেববাবুকে কিন্তু এজন্য কোন চিন্তিত দেখা গেল না—।

প্রশান্ত মুখে তিনি বললেন,—'এ নিয়ে মিথ্যে ভেবনা কমলা। বিদ্বেষ কি আর এটাকে বলা যায়? বড়লোক সম্বন্ধে ওর একটা ভুল ধারণা হতে পারে শুধু। তবে – নিশ্চয় করে তাও আমি বলতে পারি না— বড়লোকদের সম্বন্ধে ওর মন মোহমুক্ত।'

কমলাকে নিরুত্তর দেখে আবার তিনি বললেন,—'যদি এটা ওর ভুল ধারণাই হয়—তাহ'লে এ ভাঙ্গতে পারে—একমাত্র সত্যিকার বড়-লোকের বড় মনের পরিচয় পেলে। আর আশা করা যায়—বড়লোকের মধ্যে এখনও বড় মনের নিতান্ত দুর্ভিক্ষ হয়নি।'

নীরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

করুণের সঙ্গে মেলামেশাটা কি এতই দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে লোক-চক্ষে? কৈ এতদিন ত' সে বুঝতে পারেনি?

আজ নীচে নেমে এসেছিলেন মাসীমা। বলে গেছেন অনেক কথাই। নীরার মত স্বাধীনা স্বেচ্ছাচারিণী মেয়ের কাছে তাঁর নাতনীকে আর পড়তে পাঠাবেন না—নীরার না হয় সমাজের ভীতি নেই—কিন্তু তাঁরা ত' সমাজছাড়া নন।

তাছাড়া আভাসে ইঙ্গিতে বাড়ী ছাড়বার কথাও জানিয়ে গেছেন। আরও যেসব ভাড়াটে ভদ্রলোকেরা আছেন তাঁরা এত বেপরোয়া চাল-চলন দেখতে অভ্যস্ত নন।

তাঁরাই উঠে যাবেন বলছেন,—কিন্তু একজনের জন্যে এতগুলি ভাড়াটে উঠে যাবে এত সঙ্গত নয়,—কাজেই—কাজেই নীরাকেই বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে।

নীরার কানে কে যেন তপ্ত সীসা গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তার একটা লজ্জা আর অপমানের ঝড় বয়ে গেছে—'

মাসীমার সামনে বসে সে নতমুখে শুধু ঘামতে থাকে, কোন উত্তর তার কণ্ঠে আসে না।

মাসীমা চলে গেছেন অনেকক্ষণ—তবু পাথরের প্রতিমূর্ত্তির মতই অনড় হয়ে বসে রইল নীরা।

দুরন্ত লজ্জা আর অপমানের মধ্যেই কিন্তু আশ্রয়চ্যুত হবার ভীতিই

তাকে আসন্ন মূর্চ্ছার হাত থেকে রক্ষা করল। বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে—কিন্তু কোথায় যাবে তারা?

বিশাল এই মহানগরীর কোন কোণে আশ্রয় পাবে একটি অসহায় বালক আর স্বজনবান্ধবহীনা তরুণী?

কার এ কাজ বুঝতে নীরার দেরী হয় না।

ভদ্র চামড়ায় ঢাকা এক প্রৌঢ়,—যিনি আকর্ণ হেসে লোলুপ দৃষ্টি হেনে নীরার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন।

হায় যার মাথার ওপর কোন অভিভাবক নেই,—তার কি ভদ্রভাবে বাঁচবারও কোন অধিকার নেই?

তাঁর মেয়ের বয়সী নীরা,—কিন্তু তাতে তাঁর বিবেকে কিছুমাত্র বাধে না।

করুণ—তার জীবনের দেবতা করুণ,—তার অন্ধকার জীবনের আশার প্রদীপ করুণ—তার সঙ্গে আর দেখা করা চলবে না।

সমস্ত জীবন তাহলে নীরার অমানিশার অন্ধকারে ঢেকে যাবে। করুণের সঙ্গবর্জ্জিত জীবন নীরার—সে যে বিড়ম্বনার বোঝা। সেই অভিশপ্ত নিরানন্দ জীবন নীরা কেমন করে বহন করবে? কিন্তু কোন উপায় নেই!

ছোট ভাইটিকে মানুষ করবার জন্যেই নীরাকে করুণের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। কে জানে ভদ্রলোকটির মনে আরও কি আছে!

তিনি যদি স্কুলে বেনামী চিঠি দিয়ে তার চাকরিটির শেষ করেন—?

করুণকে একথা বলতে নীরার বুক ভেঙ্গে যাবে—তবু একথা বলতেই হবে—। নিজের হৃদয় নিজের হাতেই আজ উপড়ে ফেলতে হবে—। এছাড়া আর কোন উপায় নেই—!

কোন উপায় নেই—?

নীরার অন্ধকার হৃদয়ে আশার বিদ্যুৎ হঠাৎ ঝলসে ওঠে। হয়ত নীরার এ অমূলক আশঙ্কা—।

হয়ত—হয়ত—না আর ভাবতে পারে না নীরা।

আকাশের চাঁদ করুণ,—বড়লোকের বিলাসী সুখী ছেলে সে, তাকে ধরতে যাওয়া নীরার পক্ষে পাগলামী ছাড়া আর কি—! কি হবে আর মরীচিকার পিছনে ছুটে—?

আকণ্ঠ তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাবে শুধু—পিপাসিত ওষ্ঠে বারি কোনদিনই বর্ষিত হবে না।

মনস্থিরই করে ফেলে নীরা,—তবু বুকের ভেতর থেকে একটা তীব্র যন্ত্রণা কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনিয়ে উঠে তার চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

"দিদি—দিদি—শোন—"

বিকাশের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

চমকে উঠল নীরা দুহাতে চোখ মুছে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল।

হুড়মুড় করে দরজা ঠেলে বিকাশের সঙ্গে করুণও ঢুকে পড়ল।

বিকাশ বলল,—জান দিদি—আজ ছুটির দিন দেখে করুণদা' মেট্রোর তিনখানা টিকিট কিনেছেন।

করুণও হাসিমুখে নীরাকে কি বলতে গিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

চেষ্টা করেও নীরা তার মুখ থেকে অশ্রুর চিহ্ন সব মুছে ফেলতে পারেনি। অবিরত রোদনের ফলে তার চোখ স্ফীত রক্তিম,—মুখ

ছাইয়ের মত বিবর্ণ।

বিস্মিত স্বরে করুণ বলল,—'কি হয়েছে নীরা ?'

নীরা পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে রইল।

বিকাশ দিদির মুখের দিকে হতবুদ্ধির মত চেয়ে রইল। কি হল আজ দিদির—এমন মজার খবরে অমন হাঁড়ির মত মুখ করেছে কেন ?

করুণও বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইল নীরার দিকে। সে যেন আজ প্রহেলিকা হ'য়ে উঠেছে !

অস্ফুটে তার মুখ থেকে বার হ'ল—'কি ব্যাপার—?'

নীরা সজোরে ওষ্ঠ দংশন করে কান্না চাপবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু অবাধ্য অশ্রু তবু যে চোখে এসে উপছে পড়ে !

করুণ স্নিগ্ধ স্বরে বলল,—'কি হয়েছে নীরা—বলবে না আমায় ?'

নতমুখে নীরা বলল—'বলব।'

তারপর বিকাশের দিকে চেয়ে বলল,—'বিকাশ তুই একবার বাইরে যা ত ভাই,—একটু পরে আসিস।'

বিমূঢ় বিকাশ বাইরে বেরিয়ে গেল।

রূদ্ধ স্বরে নীরা বলল,—'সিনেমা আজ আমি যেতে পারব না করুণ,—কোনদিনই আর পারব না—।'

বিস্ময়-বিহ্বল করুণ প্রশ্ন করল,—'কেন নীরা—?'

'কেন—? তা আমায় জিগ্যেস করো না করুণ,—সে কথা আমি বলতে পারব না। তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের এইখানেই শেষ হয়ে যাক।'

অতর্কিত আঘাতে বিবর্ণ হয়ে উঠল করুণের মুখ।

ব্যঙ্গ স্বরে সে বলল,—'আমার অপরাধ—?'

৫

'অপরাধ তোমার—? ছিঃ, করুণ ওকথা মনেও এনো না তুমি। অপরাধ আমার—বাংলা দেশের মেয়ে—! আমায় অকৃতজ্ঞ ভেব না। দুর্দ্দিনের বন্ধু তুমি—তোমায় কি কোনদিন ভুলতে পারব আমরা—? কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ—'

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নীরা।

'—না করুণ,—সে আর কোনমতেই সম্ভব নয়।'

নীরার কাছে এগিয়ে এল করুণ।

অশ্রু-অন্ধ নয়ন মেলে নীরা তার দিকে চাইল।

হয়ত এ দুঃস্বপ্নের এখনই অবসান হবে!

দুটি বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনের মধ্যে হারিয়ে যাবে নীরার এই দুঃসহ বেদনা।

রোমাঞ্চিত কলেবরে নীরা অপেক্ষা করে প্রিয়তমের প্রিয় মধুর আশ্বাস-শীতল বাণীর!

স্নেহকোমল স্বরে করুণ বলল,—'কেন সম্ভব নয় নীরা? তুমি এ যুগের মেয়ে হ'য়ে লোকের কথাকে এত ভয় কর? স্ত্রী পুরুষে নির্দ্দোষ বন্ধুত্ব কি তুমি স্বীকার কর না নীরা—?

বন্ধুত্ব—নির্দ্দোষ বন্ধুত্ব—? বড় ভুল করেছে নীরা। করুণের অযাচিত করুণাকে প্রেম বলে ভুল করেছে!

দেবতা তুমি। কিন্তু নীরা যে এই মর্ত্তেরই মানবী। তার বাসনা কামনা ভরা হৃদয়কে সে আর বিশ্বাস করে না। এই অসম বন্ধুত্বের এখানেই যবনিকা পড়ুক তবে।

কিছুতেই আর নিজেকে সামলাতে পারে না নীরা। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে এই সহৃদয় বন্ধুর সামনে নিতান্ত নির্লজ্জার মত।

নির্নিমেষ নেত্রে তার দিকে চেয়ে করুণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। টেবিলের ওপর মাথা রেখে নীরা কাঁদছে, অন্ধকার আকাশের মত একরাশ কালো চুল তাকে ঢেকে ফেলেছে।

তার রোদনকম্পিত দেহের দিকে চেয়ে করুণের বুকেও সমুদ্র মন্থন স্থরু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বহু আয়াসে সে নিজেকে সংযত করল।

নীরার জন্যে যতই মমতা হোক—বাজে ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় সে কিছুতেই দিতে পারবে না। ছোট থেকেই পরের আশ্রয়ে মানুষ হ'য়েছে—এ বন্ধন এখনই স্বীকার করলে কোনদিনই আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

বড় তাকে হতেই হবে।

বড়লোকের ঘরে অজস্র বিলাসিতার মধ্যে সে মানুষ হয়েছে। দারিদ্র্যকে সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে—ভয় করে। সে যে জীবনের মহা অভিশাপ!

বন্ধু হিসেবে নীরা অনবদ্য,—কিন্তু স্ত্রী বলে কি তাকে গ্রহণ করা যায়? স্ত্রী বলেও গ্রহণ করা যেত যদি—না নিজের মনের কাছে অস্বীকার করে উঠতে পারে না করুণ। যদি সঙ্গে তার ভাইটি না থাকত—আর থাকত বেশ মোটা রকমের একটি যৌতুক।

টাকা ছাড়া কি এক পাও এগোন যায় এ পৃথিবীতে? নতুন জীবন আরম্ভ করবার সময় প্রথমেই যে চাই অর্থ—নাহ'লে প্রেম বা ভালবাসা যাই বল কিছুতেই সে ফাঁক ভরানো যায় না। দুদিনেই সে সব বাষ্প হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়।

অনর্থ নিয়ে আসেনা অর্থ,—বরং অর্থ না থাকলেই জীবনটাই হয়ে যায় অর্থহীন।

বান্ধবীই থাকুক নীরা—নিরাপদ এই বন্ধুত্বই ভাল।

গাঢ়স্বরে করুণ বলল,—চুপ করো 'নীরা—কেঁদোনা। আমার সঙ্গে দেখাশোনাতেও যখন তোমার ক্ষতি হয়,—তখন নাইবা দেখা করলুম? কিন্তু আমি তোমার চিরদিন বন্ধুই থাকব নীরা,—কোন বিপদে পড়লে আমায় খবর দিতে ভুলনা যেন!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নত মুখে করুণ ঘর ছেড়ে চলে গেল। মৃতের মত পাংশু মুখে নিমেষহীন শূন্য-দৃষ্টি মেলে নীরা তার গমন-পথের দিকে চেয়ে রইল।

দক্ষিণের বারান্দায় গদি মোড়া ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সতীশবাবু উৎসুক দৃষ্টিতে দরজার দিকে চেয়ে শুয়েছিলেন। চাকর এসে রূপোর গড়গড়া পাশে দিয়ে নলটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল।

সতীশবাবু পরম আরামে চোখবুজে গড়গড়া টানতে লাগলেন। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধে বারান্দা ভরে গেল। নাকমুখ দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে আবার তিনি দরজার দিকে চাইলেন।

আয়েসের জিনিষ ত' তাঁর করতলগত—তবে আরও কি ঔৎসুক্যের জিনিষ আছে তাঁর?

আছে বইকি—তাঁর স্ত্রী হেমবরণী দেবী।

বড় ছোটতেই তাঁদের বিয়ে হয়েছিল—তাঁর বয়স চৌদ্দ আর হেমবরণীর দশ বছর মোটে।

বিয়ের পর থেকে এই দীর্ঘদিন তাঁরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকেননি।

কত ঝগড়া করেছেন ছোটবেলায়—কতবার ভাব করেছেন। হেমবরণী যখন বাপের বাড়ী গেছেন তিনিও তার সঙ্গে সেখানে গেছেন।

অস্থি-মজ্জায় সে যেন মিশিয়ে গেছে! তাকে ছাড়া জীবন চলছে এ তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। সংসারের চাপে আজকাল কটা কথাই বা হয় তাঁদের? তাই তৃষিত হয়ে সতীশবাবু এই সন্ধ্যেবেলা-টুকুর জন্যে অপেক্ষা করেন।

সংসার বলে সংসার!

হেমবরণীর সারাদিন নিশ্বাস ফেলবারও সময় থাকে না। নিজের ত' দুটি ছেলে মেয়ে; কিন্তু সংসারটি তাঁর মন্দ নয়। গ্রামের ৪।৫টি ছেলে কলেজে পড়ে—এখানেই থাকে তারা। আশ্রিত তারা কে বলবে! হেমবরণীর ছেলেই যেন হয়ে গেছে ওরাও।

কলেজে যাবার সময় বামুন পাছে তাদের ভাল করে না খেতে দেয় তাই ভেবে সমানে তাদের খাওয়ার কাছে থাকেন।

ঘরে গোটা চারেক গরু আছে। তাদের জন্য আলাদা লোক আছে অবশ্য, তবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব তদারক করানো চাই।

তারপর আবার সেই সের দশ-পনের দুধের ব্যবস্থা!

কারো দই পাতা হচ্ছে—কেউবা ভাতে খাচ্ছে—কেউবা চুমুক দিয়ে, চাকর ঠাকুরদেরও ভাতের পাতে দুহাতা দুধ না দিলে তাঁর মন ভরে না।

বাকী দুধের বাড়ীতেই ছানা কেটে মিষ্টি তৈরী করেন। সারা-দিনটা তাঁর একটি ফোঁটা অবসর থাকে না। কাজের ঠাস বুনানি দিয়ে তাঁর সময়টা তখন বাঁধানো; সেখানে সতীশবাবু নিজের নাক গলাবার ফাঁকটুকুও খুঁজে পান না!

তবে সন্ধ্যের পর সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এসে তিনি আর নীচে নামেন না।

বয়সও ত' হচ্ছে—ক্ষমতাও বোধ হয় আর নেই,—তাই সতীশবাবু সন্ধ্যেবেলা একটু তবু কাছে পান।

সব ভাল হেমবরণীর—কিন্তু ঐ পুষ্যিপুত্তুর করুণের জন্যে এতটা বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না।

কোথাকার কে তার ঠিক নেই—ঠিক যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

হেমবরণীর পিসতুত বোন বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়ীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে করুণকে কোলে নিয়ে এখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর বছরখানেক পরে তিনিও রোগে ভুগে শেষ নিশ্বাস এখানেই ফেলেন।

তখন করুণ চার বছরের ছোট্ট শিশু।

সতীশবাবু তাকে তার কাকার কাছে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—কিন্তু হেমবরণী কিছুতেই রাজি হননি। সেই থেকে নিজের ছেলের সঙ্গে করুণকেও সমান ভাবেই মানুষ করেছেন।

মানুষ কি আর করেছেন—শিব গড়তে বাঁদর গড়েছেন!

পড়াতে হচ্ছে টাকার শ্রাদ্ধ করে মেডিকেল কলেজে—অথচ বাবু তোফা বছর বছর ফেল করছেন!

পড়ায় কি আর মন আছে নবাবের? শুধু আড্ডা, বন্ধুবান্ধব—সিনেমা আর থিয়েটার দেখে সময়ের অপচয় করছে।

টাকার যত স্বচ্ছলতাই থাকুক না কেন নিতান্ত একজন পরের জন্যে এত টাকা জলে ফেলে দিতে কি কষ্টই যে হয়! কিন্তু যত কষ্টই হোক তাঁর—হেমবরণীর মনে তিনি কোন কষ্ট দিতে পারবেন না।

সেই জন্যে মনের মধ্যে তাঁর যাই থাক—বাইরে করুণের সঙ্গে তিনি সদ্ব্যবহারই করেন।

তবু ভগবান রক্ষে করেছেন তাঁর ছেলে অমিত এরকম হয়নি। কোন পরীক্ষাতেই তাকে আটকাতে হয়নি। স্কলারশিপ পেয়ে যাচ্ছে বরাবর।

সব স্নেহটা তার মার করুণ লুট করেছে বলে মনের মধ্যে সতীশ বাবুর খচখচ করে ওঠে; তবু ভাবেন ভালই হয়েছে। হয়ত ছেলের দিকে বেশী মন দেননি বেশী আদর দেননি বলেই অমিত সতীশবাবুর মনের মত হ'য়ে গড়ে উঠেছে।

ছেলের ওপর গভীর একটা মমতায় তাঁর বুক উদ্বেল হয়ে ওঠে। কিরকম একটা নিস্পৃহ নির্লিপ্ত ভাব আছে ছেলেটার।

করুণকে সে মাতৃস্নেহের ভাগীদার ভাবে না—বয়সে যদিও সেই ছোট তবু ছোট ভাইয়ের মতই, বন্ধুর মতই করুণকে ভালবাসে।

চাকর এসে আবার কল্‌কে পালটে দিয়ে গেল।

সতীশবাবু নলটা আর মুখে তুললেন না—যত প্রিয় জিনিষই হোক আর ভাল লাগছিল না।

এখনও কি হেমবরণীর সন্ধ্যেপূজো শেষ হ'ল না?

মাথাভরা টাকে হাত বুলিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সতীশবাবু। হেমবরণীর সংসারই বড় তারপর সতীশবাবু! কিন্তু তাঁর যে আগে সে—তারপর আর কিছু—তা কি হেম আজও জানে না?

হাসিমুখে হেমবরণী এসে দাঁড়ালেন।

সতীশবাবু বললেন—'যাক—এতক্ষণে তোমার সময় হ'ল!'

'সময় কি আর হয়—' শীতপাটির ওপর পা ছড়িয়ে বসে হেমবরণী বললেন—'টুলু আবার বায়না ধরেছিল দুধ খাবেনা। রত্নী ত' কিছুতেই

খাওয়াতে পারে না—। শেষে আমি কত ভুলিয়ে দুধ খাইয়ে তবে আসছি। তাই ত এত দেরী হ'ল!'

'ও তাই বল!'

এতক্ষণ বাদে নলটা মুখে তুললেন সতীশবাবু। নাকমুখ দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে মুখে চোখের এক রহস্যময় ভঙ্গী করে স্ত্রীর দিকে চেয়ে তিনি বললেন,—'নতুন প্রেম!—দেরী ত' হবেই।'

স্বামীর দিকে চেয়ে হেমবরণী হেসে উঠলেন, বললেন, 'যত বয়স বাড়ছে ততই তোমার রস উথলে উঠছে দেখছি!'

• 'রস উথলাচ্ছে—না শুকচ্ছে, বল?' মুখেচোখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটিয়ে সতীশবাবু বললেন,—'উঁহু—এ হাসির কথা নয়। স্ত্রী বেহাত হ'য়ে যাবে চোখের সামনে—'

'আঃ—' কৃত্রিম কোপে ধমকে উঠলেন হেমবরণী। 'এক্ষুনি রত্নী আসবে টুলুকে নিয়ে—। ঐ দেখ টুলুর গলা পাচ্ছি—।'

'ঐ দেখ! সাধে কি বলছিলুম? এযে দেখি পূর্ব্বরাগ—!—ঐ বুঝি বাঁশী বাজে!

স্ত্রীর মুখের দিকে চিন্তিতভাবে চাইলেন সতীশবাবু। কৌতুকে তাঁর চোখ দুটি হাসতে লাগল।

টুলুর ঝি রত্নী এসে দরজার আড়ালে দাঁড়াল। বন্দী বিহঙ্গের মত টুলু ছটফট করে তার কোল থেকে নেমে পড়ল। ছুটে এসে হেমবরণীর কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে তাঁর মুখটা ধরে উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠে সে বলে উঠল,—'দিমণি—দিমণি—জান? আমার মা-টা না? রাজা হ'য়ে গেছে!'

কি একটা রসিকতা করতে গিয়েও সতীশবাবু টুলুর কাছে এই অপরূপ বার্ত্তা পেয়ে হেসে বললেন—'কিরকম? কিরকম?'

হেমবরণীও টুলুর অভিনব কথায় হেসে উঠলেন। রত্নীকে জিগ্যেস করলেন—'কি হয়েছে রে রত্নী?'

রত্নীও মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসছিল সে বলল,—'দিদিমণি বাইস্কোপ গেল না সেজে-গুজে? সেই থেকে খোকন ঐ কথা বলতে লেগেছে মা!'

'অপরূপ! অভিনব আবিষ্কার!—কমরেড্ টুলু আমি তোমায় অভিনন্দিত করছি!'

উচ্চহাস্যে ঘর ফাটিয়ে তুললেন সতীশবাবু।

লজ্জা পেয়ে গেল টুলু। সব আনন্দ মিলিয়ে গেল তার এদের কাণ্ডকারখানা দেখে। সকলের হাসির শব্দে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে, ডুকরে কেঁদে উঠল টুলু।

হেমবরণীর কোলের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে ফেলল। সেইদিকে চেয়ে চোখমুখের একটা হতাশ ভঙ্গী করে ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লেন সতীশবাবু। একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন,—'না—আমি হার্টফেল করব!'

স্বামীর দিকে তিরস্কারের দৃষ্টি হেনে মৃদুস্বরে হেমবরণী বললেন,—'থামাও বাপু তোমার রঙ্গ-রস।' তারপর দরজার দিকে চেয়ে বললেন,—'তুই যা রত্নী—পরে এসে টুলুকে নিয়ে যাস।'

রত্নী চলে গেল।

টুলুর কান্নাভরা মুখখানা চুম্বনে ভরে দিয়ে হেমবরণী আদর করে ভোলাতে লাগলেন।

সতীশবাবু গুণ-গুণ করে কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন,—

'আমি সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল!'

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠে এল ঝুমি।

বহুক্ষণ একজায়গায় বসে থেকে হাত-পাগুলো যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। মৃণালের মত দুটি বাহু আন্দোলিত করে সে আড়মোড়া ভাঙ্গল!

গলির গ্যাসের আলোটা তেরছা ভাবে তার বিছানায় এসে পড়েছে। একধারে তক্তাপোষের ওপর তার সামান্য বিছানা বড় পরিপাটি করে করা। শুভ্র চাদরটি নিভাঁজ করে পাতা। পরপর দুটি মাথার বালিশ, ওয়াড়গুলি বকের পালকের মত সাদা, পাড়ের দিকে হাল্কা কমলালেবু রং‌এর গায়ে ঢাকা দেবার জন্যে বিছানার চাদরটি পাট-করা আছে।

নিজের হাতে তৈরী সব জিনিষ—মনেই হয়না।

প্রশংসাভরা দৃষ্টি নিয়ে ঝুমি দেখল—। বিছানাটা যেন শোবার জন্যে তাকে ডাকছে—। রাত ত' আর কম হয়নি!

কিন্তু ঘুম নেই আজ আর চোখে।

এত রাত জেগে কোনদিনই পড়েনা ঝুমি। বাবা-মা পাশের ঘরেই শোন, বেশী রাত জাগতে দেননা—তাছাড়া নিজেরও ঘুম পেয়ে যায়। কিন্তু আজ চোখ দুটো জ্বলছে; ঘুম যে সহজে আসবে না বেশ বোঝা যাচ্ছে।

এখন যদি একবার সেতারটা নিয়ে বসা যেত।

দেওয়ালে টাঙ্গানো খাপে ঢাকা তারের যন্ত্রটায় ঝুমি সস্নেহে হাত বুললো। সুরের ঝঙ্কারে নিজের অশান্ত মনটাকে ডুবিয়ে দেওয়া যেত তাহলে।

বাজাবে নাকি ঝুমি ?

দূর! তাইকি হয়? পাশের ঘরেই বাবা-মা ঘুমচ্ছেন—জেগে উঠে ভাববেন কি তাঁরা ?

হেসে ফেলল ঝুমি। রাঙা দুটি গালে টোল পড়ল। পাতলা রাঙা ঠোঁটের মাঝে একসারি মুক্তার মত দাঁত দেখা গেল। আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল ঝুমি।

সুঠাম দীর্ঘচ্ছন্দ দেহ। চুল বাঁধেনি আজ। মা কতবার বলেছেন কিন্তু সারা বিকেল ঝুমি 'পরে যাব' বলে শুয়ে শুয়ে শুধু নভেল পড়েছে। মাঝে মাঝে নিয়ম ভাঙ্গতে ভারী ভাল লাগে কিন্তু। রাশি রাশি কোঁকড়ান কালো চুল কাঁধে, পিঠে, বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। আয়নার সামনে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে ঝুমি বিজয়িনীর হাসি হাসল।

রাত্রি গভীর হয়েছে—কিন্তু আজ নিয়মের নিগড় ভাঙ্গতেই যেন ভাল লাগছে—। বড় ইচ্ছে করছে একটু বাজাতে। এখন যদি সে বাজনা আরম্ভ করে দেয়—কি হয় ?

কি হয়? পাড়ার ছেলেরা তাহলে বোধহয় আজ সারারাত ঘুমোয় না। পথে পথে পাগলের মত ঘোরে।

অনেক ছেলের মায়ের মুখেই অনুযোগ শোনা যায়,—ঝুমি নাকি তাদের ছেলের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছে!

এর ওর তার মুখে মুখে ঘুরে কথাটা তার কানেও এসেছিল।

ঝুমির মুখের হাসি মিলিয়ে সেখানে অপরিসীম বেদনা ও বিতৃষ্ণার ছায়া ভেসে উঠল।

কিন্তু মায়েরা যতই পুত্ররত্নগুলির জন্য চিন্তিত হোন—ঐ ক্যাবলা-কান্তগুলির ওপর ঝুমির কোন মোহই নেই। রোয়াকে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যারা রাজনীতির-আসর-জমকানো গলা-ফাটানি চিৎকারে জিততে চায়—তারাই আবার একলা কোন মেয়েকে পথে দেখলেই পিছনে নানা রকম মন্তব্য করে নিজেদের বিদ্যে জাহির করে।

এক একটা মন্তব্য শুনে আগে আগে হাসি পেত ঝুমির।

'উঃ—ডাঁট দেখনা!'

নিতান্ত নির্ব্বিকার ভাবে যেতে যেতেও তার নির্লিপ্ততা বজায় রাখতে পারত না ঝুমি।

হাসি চাপবার দুরন্ত চেষ্টায় তার চোখ মুখ আরক্ত হয়ে উঠত। আজকাল আর হাসি পায় না। নিস্পৃহ ভাব যথাসাধ্য বজায় রাখে। কিন্তু যখন অভদ্রর মত এক এক কলি গান গেয়ে ওঠে—তখন রাগে আর লজ্জায় ঝুমি আগুনের মতই রাঙা মুখে পথ দ্রুত অতিক্রম করে যায়।

কুঁজো থেকে চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে ঝুমি আবার আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল।

কালো আবলুশ কাঠের মসৃন ফ্রেমে বাঁধানো মানুষ-প্রমাণ আয়নাটি তার বাবা তার এক জন্মদিনে তাকে উপহার দিয়েছিলেন। ঝুমি তখন নিজের রূপ দেখতে অসম্ভব ভালবাসত!

ভাল কি আজও বাসেনা?

হাসল ঝুমি। বাসে বইকি। কিন্তু বড় হয়ে থেকে অন্যলোকের সামনে নিজেকে দেখতে ভারী লজ্জা করে তার।

এমনিতেই ত' সকলে তাকে গর্ব্বিতা ভাবে!

আয়নার নীচে সুদৃশ্য ব্র্যাকেটে ঝুমির প্রসাধন-সম্ভার। এক কৌটা রেণুকা পাউডার—আর একশিশি হিমানী স্নো! এর বেশী তার কিছু দরকার হয় না।

বড় বড় বঙ্কিম পল্লব-ঘেরা টানা দুটি চোখে বিধাতা নিজের হাতে কাজল পরিয়ে দিয়েছেন।

লিপষ্টিক তার দরকার আছে নাকি? রাঙা ঠোঁঠ উল্টে দেখল ঝুমি।

নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চাইল ঝুমি। তার চোখে প্রচ্ছন্ন গর্ব্বের ছায়া! স্কটিশের কোন এক ছাত্র নাকি তাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিল—। তার রূপের বহু স্তবগান করে শেষ করেছিল—'প্রাণহীনা পাষাণী প্রতিমা!'—বলে।

কবিতাটি সহপাঠিনীদের মারফৎ ঝুমির হাতে এসেছিল—তারা কোথা থেকে পেয়েছে জানতে ঝুমির কোন কৌতূহল হয়নি। আর কোন লাইনই কবিতার ঝুমির মনে নেই—শুধু এই কটি কথাই মনে আছে—। অতর্কিতে আঘাত পেয়েছিল বলেই একটি কথা ভুলতে পারেনি।

সত্যই কি সে প্রাণহীনা? সে কি পাষাণী?

পাষাণী বইকি।

ঝুমির মুখ থেকে গর্ব্বের ছায়া মিলিয়ে গিয়ে বেদনার মেঘে অন্ধকার হ'য়ে উঠল—তার চোখ জলে ভরে গেল।

প্রাণহীনা পাষাণী না হলে—

মল্লি,—মল্লিকা—তার বাল্যসখী স্কুল-কলেজের একমাত্র বান্ধবী তাকে সে শুধু শুধু বর্জ্জন করল!

বেথুনে ছোট ক্লাস থেকে তারা একসঙ্গে পড়েছে।

মল্লির কথা মনে হ'লে ঝুমি আর নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। স্নিগ্ধ শ্যাম লাবণ্যে ঢল ঢল একটি মুখ মনে পড়ল তার।

ঝুমির মত চোখ ধাঁধানো রূপ না থাক—অমন একটি করুণ কোমল ভালবাসাভরা হৃদয় ঝুমি কোথায় পাবে? হৃদয়-সম্পদে সে যে ঐশ্বর্য্যময়ী।

মুনিমনোহারিণী রূপ নিয়েও ঝুমি—প্রাণহীনা—হৃদয়হীনা—পাষাণী ছাড়া আর কি!

কেন—কেন—কেন অমন করে সে? লোককে ব্যথা দিয়ে কেন এত আনন্দ পায়?

আনন্দ কি আর সত্যিই পায়? কে জানে!

কিন্তু কিছুতেই এ স্বভাব কেন তার বদলায় না?

দুহাতে মুখ চেপে ঝুমি বিছানায় চাপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

বৈকালিক প্রসাধন সেরে মল্লিকা বড় আয়না দেওয়া আলমারীটার সামনে দাঁড়িয়ে তার বেশবাস ঠিক করে নিচ্ছিল। পা দিয়ে শাড়ীটা আরো একটু নামিয়ে নিয়ে ঘাড়ের কাছের খোঁপাটি দুহাত দিয়ে ঠিক করতে করতেই আয়নাতে দেখতে পেল দরজা দিয়ে সমর প্রবেশ করছে।

উৎফুল্ল হ'য়ে মুখ ফেরালো মল্লিকা—।

'ওমা! তুমি?'

মসমস করে জুতোর শব্দ ক'রে মিলিটারী কায়দায় তার পাশে এসে দাঁড়াল সমর।

গুরুগম্ভীর মুখে জিগ্যেস করলে,—'আমি জানতে চাই,—তোমার মতলব কি?'

'মতলব! মতলব আবার কি?'

আকাশ থেকে পড়ল মল্লিকা।

তেমনিই গম্ভীরভাবে সমর বলল,—'তুমি আমাদের বাড়ী যাবে—কি—না?'

খিল খিল করে হেসে উঠল মল্লিকা।

'ওমা! এযে একেবারে সমর সাজে সেজে এসেছ দেখছি—কি কি ব্যাপার বল ত'?'

ঘাড় নেড়ে কৃত্রিম দুশ্চিন্তায় মুখ অন্ধকার করে সমর বলল—'হাসি নয়,—ওসব ভাঁওতায় আর আমি ভুলছি না। বাড়ী যাচ্ছ কবে? দাদার 'কনে' দেখার নাম করে দিব্যি বাপের বাড়ী এসে গ্যাঁট হ'য়ে বসে আছ।'

'বারে! কনে কি দেখছিনা আমি?'

আয়নায় একবার নিজের বেশবাসের সঙ্গে স্বামীর মুখের হাসি চাপবার ব্যর্থ প্রয়াসটাও দেখে নিল মল্লিকা।

সমরের হাতধরে বলল,—'নাও নাও। লক্ষ্মী হয়ে বোস ত' আগে। ঝগড়াটা পরে করলেও হবে। তারপর? বাবা মা বুঝি পাঠিয়ে দিলেন নিয়ে যাবার কথা বলতে? সবে ত' পনের দিন মোট এসেছি—তাতেই তাগাদা? বিয়ে হয়ে গেছে বলে কি আর বাপের বাড়ী থাকতেই পাব না?'

বড় সোফাটায় সমরের পাশে এসে বসল মল্লিকা।

সমর বলল—'না—তাঁদের ত' কোন গরজই নেই দেখছি! কিন্তু

আমি কি ক'রে একা থাকি—বলত মলি? আমার জন্ত তোমার মায়া হয় না?'

সলজ্জ হাসিতে মল্লিকার মুখ ভরে গেল।

আনন্দে গর্ব্বে বুক উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তার।

নিজের মনের ভাব গোপন করে সমরের দুটি হাত ধরে কৌতূকের সুরে সে বলল,—'হ্যাগো মশাই হ্যাঁ,—সব জানা আছে। বাড়ী কত থাক তুমি? ক্লাব, বন্ধুবান্ধব, হাসপাতাল আর রোগী এই নিয়েইত' তোমার দিন কেটে যায়। বাজে কথার ঝুড়ি!'

স্ত্রীর নাকটা নেড়ে দিয়ে সমর বলল,—'না গো মশাই—না। তুমি না থাকলে কোথাও যাই না। বিশ্বাস না হয় বাড়ী গিয়ে জিগ্যেস কোরো সবাইকে। কোন প্রেরণাই পাইনা মলি—সত্যি বলছি। কবে যাচ্ছ—?'

'এদিকের একটা কিছু ব্যবস্থা না হ'লে—'

সমর দুহাত দিয়ে তাকে কাছে টানবার চেষ্টা করতেই সতর্ক মল্লিকা সোফার এক কোণে সরে বসল।

পর্দ্দা সরিয়ে গোবিন্দ খাবারের ডিস্ নিয়ে ঘরে ঢুকছে। একটা টিপয়ের ওপর খাবার দিয়ে গোবিন্দ খানিক পরেই চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে এল।

আরেকটা টেবিলে সেগুলো নিপুণভাবে সাজিয়ে মল্লিকার সামনে এগিয়ে দিল।

গোবিন্দ মল্লিকাদের অনেকদিনের পুরনো চাকর। বয়সের পদ-মর্য্যাদার গৌরবে সে সর্ব্বদাই গুরুগম্ভীর।

প্লেট থেকে একটা টোষ্ট তুলে নিয়ে সমর জিগ্যেস করল—'কি গোবিন্দ ভাল আছ ত?'

গোবিন্দর পাকা গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি দেখা গেল। সে বলল,—'ভাল আছি। আপনাদের বাড়ীর সব ভাল জামাইবাবু?'

সমর ঘাড় নেড়ে জানাল 'ভালই।'

মল্লিকা বলল—আমিই চা করে দেব গোবিন্দ দা—আর কোন দরকার নেই।

গোবিন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ভালকরে দরজার পর্দ্দাটিও টেনে দিয়ে যেতে ভোলে না।

অস্ফুটে মন্তব্য করল সমর—'করিৎকর্ম্মা!'

সমরের মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠল মল্লিকা।

সমর দুহাতে মল্লিকাকে কাছে আকর্ষণ করে নিল। গভীর সুখে মল্লিকার মাথাটা তার কাঁধে এলিয়ে পড়ে। আয়নাটাও সুখী দম্পতির প্রতিবিম্ব বুকে নিয়ে গরবে ঝলমল করে হেসে উঠল।

কেটে যায় কিছুক্ষণ।

বাইরে কার পদশব্দ। সোফার কোণ ঘেঁষে আবার সরে বসল মল্লিকা। মুখে ফুটিয়ে তুলল নির্লিপ্ত একটি ভাব। মুখের হাসিটা কিন্তু ঢাকা যায়না! দুহাতে খোঁপা ঠিক করবার ছলে নতমুখে হাসি গোপন করল মল্লিকা।

সমরও পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে ধরিয়ে নিয়ে উদাসীন ভাবে টানতে থাকে।

গোবিন্দ ঘরে ঢুকে উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো তুলে নিয়ে গেল।

সমর বলল—'প্রায় হাজার খানেক ত' মেয়ে দেখলে মলি—এখনও কি দাদার উপযুক্ত পাত্রী খুঁজে পেলে না?'

'হাজার খানেক!' রাগে মুখ ভারী হয়ে উঠল মল্লিকার।

'কে বলল এমন আজগুবি কথা?'

'কে আবার! স্বয়ং পাত্র। সে ত' অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে তোমার মেয়ে দেখার বাতিকে!'

'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!'—তা বলবে বইকি! রাগে ক্ষোভে মল্লিকার চোখে জল এসে পড়ল।

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সমর হো হো করে হেসে উঠল।

'আরে না না। অতটা ও বলেনি। তবে মেয়ে পছন্দ তোমার কোনদিনই হবে না মলি। চোখে তোমার সেই অপরূপ রূপই বোধ হয় ভাসে!'

'কেমন করে জানলে!' বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সমরের মুখের দিকে চেয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল,—মল্লিকা।

সমর হেসে বলল,—'দেখলে ত'? ঠিক ধরিনি আমি?'

তা' তোমার সেই শৈশব-সঙ্গিনী আদি ও অকৃত্রিম বন্ধু রূপসীকুল শ্রেষ্ঠাকেই দাদার বৌ করে আন না কেন?'

'তুমি কি ভাবছ, অত রূপ নিয়ে তার এখনও বিয়ে হতে বাকী আছে?—তাছাড়া—'

গাঢ় স্বরে মল্লিকা বলল,—'জানত' কত তুচ্ছ কারণে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেছে—? বড়লোকদের সে মর্ম্মান্তিক ঘেন্না করে!'

'অদ্ভুত!'

অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল সমর।

সত্যিই কি কোন কারণ আছে এর—? কোন বড়লোকের বিষাক্ত ব্যবহারই কি এর কারণ, না শুধুই খাম-খেয়াল? বড় দেখতে ইচ্ছে করে বসোরার গোলাপের মত সেই খামখেয়ালী মেয়েটিকে।

সত্যি বিষয়টি একেবারেই তুচ্ছ।

বেথুন কলেজের কাছেই বাড়ী বলে মল্লিকা বরাবর হেঁটে গেছে স্কুলে। সাধাসিদে পোষাকও তাদের বাড়ীর বিশেষত্ব। তাই বন্ধু তার কোনদিনই টের পায়নি মল্লিকা বড়লোকের মেয়ে।

কলেজে উঠেও হেঁটেই গেছে। পরপর কয়েক দিন শুধু সতীশবাবু নিজে কাজে বেরুবার সময় মেয়েকে কলেজ পৌছে দিয়েছেন।

চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে মোটরটার দিকে কয়েকদিন চেয়ে থেকেছে সে। তারপর একদিন প্রশ্ন করেছে—।

'কার সঙ্গে আসিস মল্লি?'

'আমার বাবা।'

'গাড়ীটা কাদের—?'

'কাদের আবার—? আমাদের।'

বিস্মিত হয়েছে মল্লিকা বন্ধুর প্রশ্ন শুনে। অন্ধকার মুখের দিকে চেয়ে বিরক্ত হয়েছে।

ব্যাস্! তারপর তার সঙ্গে আর একটি কথাও বলেনি বান্ধবী।

ছায়ার মত থাকত' দুজনে। কেউ কারু ছায়া মাড়ায়নি তারপর।

অভিমানে মল্লিকাও কথা বন্ধ করেছে।

কিন্তু কতদিন আর এ অভিমান পুষে রাখতে পারত মল্লিকা কে জানে!

হঠাৎ যদি কলেজের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ না হ'ত তাহ'লে হয়ত আবার ভাব হ'ত তাদের।

বিয়ে হ'য়ে গেল মল্লিকার। পড়ার পাঠও উঠে গেল তারপর। তারপর—?

একটা স্বপ্নের মধ্যেই কেটে গেল একটা বছর।

কোলে এল টুলু। এতদিন কি আর তার বিয়ে হতে বাকী আছে? ঐতিহাসিক যুগে জন্মালে যা'র জন্যে একটা খণ্ড প্রলয় হ'য়ে যেত—সে হয়ত বিজাতীয় বিদ্বেষ নিয়েও কোন বড় লোকের বাড়ীই আলো করেছে!

একা একা ঘুরে বেড়ায় ঝুমি।

ঘুরে বেড়ায় কলেজের কম্পাউণ্ডে, দেবদারু, আম, শিউলি-গাছের ঘন ছায়ায় ছায়ায়, আঠারো বছরের মন কেমন-করা মন নিয়ে।

অফ পিরিয়ডে অনেক মেয়েই এসেছে এখানে—এক একটি দল। গাছের ছায়ায় ঘন হ'য়ে বসেছে। জটলা চলছে সেখানে। কতক কমন-রুমেও আছে।

চিনেবাদাম ভাজা ভাঙ্গার শব্দের সঙ্গে মিষ্টি হাসির শব্দ। মিষ্টি কথার কলগুঞ্জন।

তার মত যুথভ্রষ্ট কেউ নয়!

একাই ঘুরে বেড়ায় ঝুমি। সঙ্গী নেই কেউ। খাপছাড়া স্বভাবের জন্যে কেউই সঙ্গী হ'তে পারে না তার। সকলের সঙ্গে সমানভাবে মেশবার মত সহনশীলতাও তার স্বভাবে নেই—তাই সে একা।

মাঝে মাঝে মল্লির জন্যে মনটা কেমন করে ওঠে—ভারী শূন্য লাগে তখন।

নাহ'লে ছায়াঢাকা তরুতলে একা একা উন্মনা ভাবে ঘুরে বেড়াতে ভারী ভালো লাগে ঝুমির।

লাল ছিটের ব্লাউজের সঙ্গে গেরুয়ারঙের মিলের শাড়ী পরণে গলায় পলার সঙ্গে সোনার ছোট মটর গাঁথা ছোট একটি হার। হাতে সরু দুগাছি সোনার চুড়ি।

শান্তিনিকেতনী কাজ করা লাল চামড়ার চটি দিয়ে ঘাস মাড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়।

কোঁকড়া চুলগুলো খোঁপার শাসন থেকে উড়ে উড়ে এসে পড়ে মুখে। যেন প্রস্ফুটিত পদ্মের লোভে মধুলুব্ধ ভ্রমর এসে গুঞ্জন করছে।

উড়ে পড়ে পিঠের আঁচলটি।

ঈর্ষাভরা চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে কেউ কেউ।

একজন সহপাঠী সহানুভূতিভরা কণ্ঠে বলল,—আহা! মল্লি চলে গিয়ে কি রকম একা পড়ে গেছে বেচারী। কি রকম ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখ? ঠিক যেন উদাসিনী রাজকন্যা!

উদাসিনী রাজকন্যার দিকে কেউ কেউ হিংসায় জ্বালাভরা চোখে চায়।

'উদাসিনী রাজকন্যা!' খিল খিল করে হেসে উঠল ক'টি মেয়ে।

'বেশ বলেছিস দীপালি—পরে তুই সাহিত্যিকা হবি।'

ধ্যান ভেঙ্গে যায় ঝুমির।

বুঝতে পারে তাকে নিয়েই আলোচনা হচ্ছে।

আরো দূরে চলে যায়।

একা একা ঘুরে বেড়ায় নীরা।

স্কুলের ছুটির পর আর বাড়ী না ফিরে গড়ের মাঠে চলে এসেছে।

বুকভরা বেদনা আর হতাশা নিয়ে একা ঘুরে বেড়ায়। বাড়ী ফিরতে আজ আর ইচ্ছে করছে না।

কার জন্যেই বা বাড়ী যাওয়া এরই মধ্যে?

একটিমাত্র বন্ধন ছিল সে নিজেই চলে গেছে। চলে গেছে বিকাশ রাগ করে না অভিমান করে? না—রাগ করে নয়। গেছে ভাগ্য অন্বেষণে।

লিখে রেখে গেছে ছোট্ট চিঠি—

'দিদি,

অনর্থক বিজ্ঞাপন দিয়ে পয়সা নষ্ট কোর না। অনেক ভেবে-চিন্তেই আমি যাচ্ছি। তোমার খানিকটা ভার কমিয়ে দিলুম—কিন্তু রাগ করে নয়।

ভুল বুঝবে না তুমি আমি জানি। যদি কোনদিন মানুষ হ'য়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি—তাহলেই ফিরব।'

কোথায় যাবে বিকাশ? এই বিশাল নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কেমন করে ঐটুকু ছেলে তার স্থান করে নেবে? সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। মানুষ যদি হতেই হয় কেমন করে মানুষ হবে কারো সাহায্য ছাড়া?

পাষাণের মত ভাবলেশহীন মুখে ঘুরে বেড়ায় নীরা। বুকের মধ্যে মাথা কুটে মরতে থাকে স্নেহময়ী দিদি—'ফিরে আয় বিকাশ, ফিরে আয়। অবুঝ অভিমানী ছোট ভাইটি আমার!'

বুকের মধ্যে অসহ্য একটা বেদনা।

এখনই হয়ত পাষাণ-প্রাচীর ভেঙ্গে অশ্রুর ঝর্ণা বইবে! কিন্তু এ ত' কাঁদবার জায়গা নয়।

চারিদিকে হাসিমুখ। জোড়ায় জোড়ায় ভ্রমণরত সুখী নরনারী। 'কেন তোমার এ বিধান? একটা দুঃখী মেয়েকে—দুঃখের পর দুঃখ দিয়ে তুমি কি সুখ পাও?'

বিধাতার কাছে অনুযোগ করতে গিয়ে নীরা তাঁর অপার ঐশ্বর্য্যের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

গোধূলির স্বর্ণ-রেণু ময়দানকে ময়দানবের তৈরী কোন মোহময় মায়াপুরী করে তুলেছে!

কে যেন পাশে এসে দাঁড়াল।

আবছা চোখে পড়ল কার শাড়ীর আঁচল।

'বাঃ—চমৎকার!'

চেনা একটি কণ্ঠস্বর আর হাসির শব্দে চমকে উঠল নীরা। 'কি চিনতে পারছিস না?' হাসতে হাসতে বলল মেয়েটি।

চিনতে পারবেনা আবার শৈশবসঙ্গিনী কুন্তলাকে? কলেজেও তারা সহপাঠিনীই ছিল।

বেশ বাস হাবভাবে সম্পূর্ণ বদলালেও চেনা যাবেনা তাকে?

আঁকা ভুরু। টুকটুকে করে লীপষ্টীক দেওয়া ঠোঁটে। কাজল দিয়ে টানা চোখ। শ্যামবর্ণ রঙ,—গাঢ় রঙের প্রলেপে গৌরবর্ণ। চিবুকের ছোট্ট তিলটিও আঁকা।

পরণে জামরঙের জর্জ্জেট শাড়ী আরো পাতলা জামার সঙ্গে। ব্লাউজের তলার অন্তর্বাস নির্লজ্জ ভাবেই দেখা যাচ্ছে। তীব্র মধুর একটা সৌরভ তার গায়ে।

কার মুখে যেন শুনেছিল কুন্তলা সিনেমায় নেমেছে। কে জানে সত্যি কিনা!

তার হাত ধরে নীরা বলল,—'সেকি! তোকে চিনতে পারব না কুন্তী—?'

হাতের নখের দিকেও চাইল নীরা। সূঁচল লম্বা নখ রেখেছে, নেল-পালিশ তাতেও।

'তবু ভাল।' চোখের চটুল এক ভঙ্গী করে কুন্তলা হেসে উঠল। —'কণে দেখা আলোয় তোকে যা দেখাচ্ছিল!'

—'তা বরটি কোথায়?'

'বর—?'

'ঐ হোল। বর না হোক—বর্ব্বর। হাবার মত চেয়ে আছিস যে—? এমন আলো—এমন পরিবেশ—সঙ্গী নেই কেউ—?'

সঙ্গী? অন্যমনস্ক হয়ে যায় নীরা।

কিছুদিন আগেও সঙ্গী ছিল—আজ আর কেউ নেই। একা। শূন্য তার হৃদিমন্দির। গৃহও শূন্য—বিকাশ নেই।

'ইভনিং ইনপ্যারী' মাখা রুমালখানা আলতোভাবে মুখে একবার বুলিয়ে নিল কুন্তলা। নীরার হাত ধরে আকর্ষণ করে বলল—চল কোথাও নিরিবিলি বসিগে—অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।'

অনেক কথা—অনেক ব্যথা নীরার বুকেও জমে আছে।

একজনের কাছেও এ বেদনার বোঝা নামান যায় যদি হাল্কা বোধ হয়। কিন্তু সেই অন্তরঙ্গ সখী কি আর আছে কুন্তলা? যার কাছে সব কথা উজাড় করে ঢেলে দেওয়া যায়?

যায়—যায়—নিশ্চয়ই যায়। হাতের কোমল মধুর উত্তপ্ত স্পর্শেই জানিয়ে দিচ্ছে আজও তার অন্তরে নীরার তেমনিই জায়গা আছে, আজও সে পরমাত্মীয়া।

বাইরের চাকচিক্য দেখে নীরা যেন তাকে ভুল না বোঝে! গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল দুজনে।

নীরার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল কুন্তলা।

কী শীর্ণ পাণ্ডুর ম্লান তার মুখ!

কী গভীর ক্লান্তির ছায়া তার সারা দেহে!

গভীর মমতায় বান্ধবীর দুটি করতল নিজের মুঠোয় চেপে ধরে কুন্তলা বলল—'তারপর? কি করছিস—সেই স্কুলমাষ্টারীই বোধ হয়?'

'হ্যাঁ ভাই।' ম্লান হেসে বলল নীরা।

'তাই বলি!' সহানুভূতি মাখা স্বরে কুন্তলা বলল—'না হ'লে এমন শ্রী হবে কেন! ফাঁকিও বোধ হয় দিতে শিখিসনি এখনও? সারাদিন ঐ বোকা মেয়েগুলোর কাছে বক্ বক্ করে কি লাভ হয় বলতে পারিস?' কি হবে ওদের পড়িয়ে? যারা পাশ করবে মুখস্ত করে—তারপর বিদ্যে শিকেয় তুলে রেখে মাসিকপত্রের পাতায় খুঁজতে থাকবে করলার মোরব্বা কেমন করে রান্না করা যায়? কি কি প্রলেপ মেখে কবার শুকলে আর স্নান করলে রং ফর্সা হয়ে ওঠে? কেন করিস অত পণ্ডশ্রম?'

পণ্ডশ্রম! নীরার ভাল লাগে না কথাটা। ভাল লাগে না একজন মেয়ের মুখেই মেয়েদের দৈন্যের কথা শুনতে।

তবু কিছু বলে না। তর্ক করবার মতো ইচ্ছা বা শক্তি কোনটাই নেই আজ। বলল—'পেট চলে না যে! কিছু ত একটা করতে হবে?'

'হুঁ।' হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা লুফতে লুফতে কুন্তলা বলল—'আমি কি করছি বল দেখি?'

সিনেমায় নামার কথাটা মুখে বেধে গেল নীরার। হেসে বলল,—'কি করে জানব? সাজসজ্জা দেখে ত' মনে হয় বিয়ে করেছিস,—বোধ হয় খুব বড় লোক ভদ্রলোক!'

'বিয়ে!' হেসে লুটিয়ে পড়ল কুন্তলা। 'বিয়ে করতে যাব কি দুঃখে? নাঃ—তুই দেখছি সেই রকম ন্যাকা-বোকাই আছিস!'

দুঃখে? নীরা ভাবতে থাকে দুঃখেই কি লোকে বিয়ে করে?

সখীর কাছে আরও ঘন হ'য়ে সরে এল কুন্তলা।

অন্ধকারও ঘন হয়ে উঠল তাদের চারিদিকে।

কুন্তলা বলল—'কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আমিও যে কি ন্যাকাই ছিলুম! মনে আছে তোর কলেজ-ম্যাগাজিনে আমার লেখা সেই কবিতাটি—?

'আমি ভালবাসি একটি মুগ্ধ মন
আর ভালবাসি একটি গৃহের কোণ—'

মনে আছে?'

'মনে নেই আবার!' নীরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—

'যেই গৃহকোণ আমারই রচনা হবে—
যে মুগ্ধ মন আমারে ঘিরিয়া রবে—'

তার কথা শুনেই হি হি করে হেসে উঠল কুন্তলা।

'ইস্! কি বোকাই তখন ছিলুম। লুব্ধ মন অনেক আসেপাশে ঘুরঘুর করত বটে—কিন্তু মুগ্ধ মন কোথায় পাব এই বিংশ শতাব্দীতে?'

নীরা একাধিক লুব্ধ মনের কথা জানে না। একটিমাত্র মনের খবরই সে জানত,—লুব্ধ বা মুগ্ধ সে মন নয়। একটি করুণাভরা নির্লিপ্ত উদাস মন!

কুন্তলা বলল,—'কলেজ-ম্যাগাজিনে কবিতাটা বার হতে কি খ্যাতিই না পেয়েছিলুম সেদিন! কিন্তু সেটা শুধুই কবিতা নয়—আমার মনের গোপন কথাটিই ছিল।'—গাঢ় হয়ে এল কুন্তলার কণ্ঠস্বর।

অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না তার। কাজলপরা চোখ দুটোও কি ভিজে উঠেছে? নীরা তার করতলে মৃদু চাপ দিল।

খানিক নিস্তব্ধতা।

নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে কুন্তলার হাসিতে।

হাসতে হাসতেই সে বলল,—'উঃ—কি বোকাই ছিলুম তখন! ভাবলে এত হাসি পায়। মুগ্ধ মন কোথাও খুঁজে পাবেনা। এই চলমান জীবনে—এই গতির স্রোতে—কোথাও সেই ছাতাপড়া মুগ্ধ মনের স্থান নেই। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পাবে। পাবে কাব্যে আর সাহিত্যে। বাস্তবে যদি তাকে খুঁজতে যাও—রূঢ় আঘাতে স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে—খান্ খান্ হয়ে যাবে তুমি।'

'ছাতাপড়া মুগ্ধ মন!' বান্ধবীর অভিনব আবিষ্কারে চমকে উঠল নীরা। কোন কথাই খুঁজে পায়না এমন উপমার পরে।

'যাই হোক—মুগ্ধ মনের কথা থাক এখন। ভারী মুস্কিলে পড়ে গেলুম। বি. এ. পাশ করতে পারলুম না—মা গঞ্জনা দিতে লাগলেন। তাঁর কোন দোষ নেই—অবিরাম খেটে আমার জন্যে উপার্জ্জন করেছেন—। আই. এস. সি পড়িয়ে মেডিকেল কলেজে দেবার ইচ্ছে ছিল—নার্সদের যা একমাত্র আদর্শ! আমি আর্টস নিলুম তখন থেকেই মা চটেছিলেন তারপর বি. এ. পরীক্ষার ফল দেখে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল!' আবার হেসে উঠল নীরা—জলতরঙ্গ বাজনার মত কৃত্রিম মিষ্টি সুরে।

'মার দোষ দিচ্ছি না। বাত-ব্যাধি তাঁকে তখন জর্জ্জরিত করে তুলেছে। যাকে খেটে খেতে হয়—একটি দিন বসলেও যাদের হাঁড়ি চড়েনা—দিনের পর দিন পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকা—তার পক্ষে কি শান্তি, কি অশান্তি বল দেখি? বেশ হেসে খেলে দিন যাচ্ছিল হঠাৎ রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে গেল। অবিলম্বে রোজগার করতে হবে এবং প্রচুর রোজগার করতে হবে।'

'প্রচুর?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল নীরা।

'তা না ত' কি! কেমন করে মা'র চিকিৎসার খরচ চলবে? কেমন করে নাহলে খেয়ে পরে ভদ্রভাবে দিন কাটানো যাবে? কিন্তু বিশ্বে ত' এই! চারিদিকে রাশি রাশি সরষে ফুল ছাড়া আর ত কিছুই তখন দেখতে পাচ্ছি না। মা'র জমানো টাকা ক্ষয়ে আসছিল আর ক্ষয়ে আসছিল তাঁর একমাত্র সন্তানের ওপর ভালবাসা।—এমন সময়—' কৌতুকে হেসে উঠল কুন্তলা।

'এমন সময় কি বলত? রূপকথার রাজপুত্রের মত কেউ এগিয়ে এলনা বরমাল্য নিয়ে। এগিয়ে এল একটি লুব্ধ অভিজ্ঞ মন। পথ দেখিয়ে দিল। ষ্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে সব বন্দোবস্ত করে দিল। প্রথম মাসেই যা রোজগার করলুম তাতেই মা'র চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারলুম। সেবা করবার জন্যে একজন লোক রেখে দিলুম। মা'র মুখে আবার হাসি ফুটল। পথ খুঁজে পেলুম। পাথেয়রও অভাব হোলনা।'

'মাসীমা খুশি হয়েছেন—?' অস্ফুটে নীরা বলল।

'কেন খুশি হবেন না?' দৃপ্ত ভাবে কুন্তলা বলল। চিরকাল অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন—সচ্ছলতায় কে না খুশি হয়?

আদর্শের দোহাই দিয়ে মনকে চোখ ঠারিস না নীরা। এত পরিশ্রম করে ঐ ক'টি টাকায় তোর অভাব মেটে?'

'তা কি আর মেটে?' ক্লান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নীরা। কিন্তু তা বলে ঐ কি পথ!

হাজার লোকের ভীড়ের মধ্যে অভিনয়—হাজার হাজার লুব্ধদৃষ্টির সামনে—ভাবতেও নীরা শিউরে ওঠে।

সরোজিনী কিন্তু হাজার অভাবেও মত দিতেন না। সুখ না থাক—শান্তি আছে ত এপথে।

'কি ভাবছিস এত? নেমে পড় সিনেমায়। বলিস ত সব বন্দোবস্ত করি।'

'দূর!' হেসে উঠল নীরা। 'আমার জন্যে তোকে ব্যস্ত হতে হবে না,—আমি বেশ আছি।'

উঠে পড়ে কুন্তলা বলল,—'আচ্ছা আসি ভাই। তবে—নাক কুঁচকোবার মত এ লাইন আর নেই। কত বড় বড় ঘরাণাঘরের মেয়েরাও সিনেমায় নামছে আজকাল। আই. সি. এস-এর স্ত্রীরাও যে এসেছে—সেকি অভাবের জন্যে? নাম যদি করতেই হয় তাহলে সিনেমা-ষ্টার হও। সাহিত্যে—কাব্যে—কেউ নাম করতে পারবে এ-যুগে? মাস্টারী করে ত কিছুই হবে না—পেটও ভরবে না জাতও যাবে!'

নীরা কিছু না বলে মৃদু চাপ দেয় সখির করতলে তার সদিচ্ছার জন্যে।

কুন্তলা ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে নীরার হাতে দিয়ে বললে—'যদি কোনদিন দেখা করতে ইচ্ছে হয়—যাস আমার কাছে। আগেই ফোন করে যাস কিন্তু—ফোন নম্বর এতেই আছে।'

'তুই আজকাল আর কিছু লিখিস না?'

'লিখি বইকি!' মিষ্টি স্বরে হেসে উঠল কুন্তলা—'না লিখে উপায় আছে? তবে কবিতা আর লিখি না। এক পত্রিকার সম্পাদক আমার জীবনী নিয়ে গেল সেদিন তাগাদা দিয়ে দিয়ে। 'এ-যুগের মহিয়সী' রচনাটার নাম। সিনেমা-ষ্টারদের জীবনী। মাস ছয় হ'ল বার হয়েই সারা সহর যে তোলপাড় হয়ে গেল! তুই আছিস কোথায়?'

বিমূঢ় নীরা এ-যুগের মহিয়সীর দৃপ্ত গমনপথের দিকে চেয়ে একা বসে রইল।

প্রত্যেক দিন যে সময় ঘুম ভাঙ্গে আজ তার চেয়েও ভোরে অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল হেমবরণীর। ভোরের দিকে ঘুমটা পাতলা হয়েই আসে, আজ কিন্তু ঘুমের মধ্যে কি একটা অস্বস্তি তাঁকে পীড়ন করছে। কারণ কি এর? কারণ খুঁজতে গিয়ে চমকে উঠেছেন হেমবরণী। বিছানায় আর শুয়ে থাকেননি, ভগবানের নাম করে উঠে পড়েছেন।

তাইত! কদিন কাজের ভীড়ে এত ছিলেন যে গোয়ালে যাওয়া হয়নি যে একেবারেই।

তাঁর শ্যামলী, ধবলী, রাঙী আর নন্দিনীর দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নি।

অবলা প্রাণী ওরা। তবু কি মমতাভরা গভীর কালো চোখে তাঁর দিকে চায়!

রত্নীর স্বামী মহিন্দরের উপরই এদের দেখাশোনার ভার আছে কিন্তু সে একেবারে বৌকে নিয়েই মশগুল হয়ে থাকে। নিজে গিয়ে না দাঁড়ালে তেমন যত্ন করে না।

দ্রুত নীচে নেমে আসেন হেমবরণী।

ভোর হয়নি এখনও। টুলু ওঠেনি। তার কলকণ্ঠে ঘর এখনও ভরে ওঠেনি।

স্নান সেরে পূজোর কাপড় পরে চন্দন ঘষতে ঘষতে হেমবরণী টের পান এইবার ঝি-চাকরের দল উঠেছে একে একে।

পূজো সেরে গরদের কাপড় পরেই দ্রুত চলে এলেন গোয়ালে। মহীন্দর উঠে আড়মোড়া ভাঙ্গছিল তাঁকে দেখে সেও এসে দাঁড়াল।

হেমবরণী পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখেন গোয়ালের দিকে তিন চার দিনের আবর্জ্জনা এককোণে জমা হয়ে আছে। বড় বড় করে কাটা খড়গুলো—ছানি ভাল করে মাথাও হয়নি। তাই ভাল করে খেতে পারেনি তাঁর আদরের গাভীরা। 'আহা মরে যাই!' হেমবরণী মহীন্দরের দিকে চেয়ে মৃদু তিরস্কার করে বললেন,—'ছিঃ মহীন্দর এমনি করেই কি অযত্ন করে—? আহা অবলা জীব ওরা!'

অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকায় মহীন্দর। আমতা আমতা করে বলল—'কালই শুধু ছানিটা ভাল করে মাথা হয়নি মা—নইলে—'

হেমবরণীকে দেখতে পেয়ে নধর রাঙা গাভী রাঙী ডেকে ওঠে—'হাম্বা!'

দড়িতে টান দিয়ে ছেঁড়বার চেষ্টা করে।

হেমবরণী হেসে উঠলেন।—'খুলে দে মহীন্দর রাঙীর দড়ি। আয় রাঙী—আয়!'

ছাড়া পেয়ে মন্থর ভাবে এগিয়ে যায় রাঙী।

আদর খাবার জন্যে হেমবরণীর কাঁধে মাথা রেখে দাঁড়ায় আদরের দুলালীর মত।

কালো দুটি গভীর চোখ যেন মৌন ভাষায় মুখর হয়ে ওঠে—'কেমন করে ভুলে ছিলে মা!'

হেমবরণী গভীর মমতায় তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। তাঁর কাঁধের ওপর মাথা রেখে রাঙী আরামে আদর উপভোগ করে।

অমিতাভ মাকে ডাকতে এসে হেমবরণীর দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খড়ের চালের গোয়ালের পটভূমিকায় গাভীকে আদররত হেমবরণী। এ যেন জননী বঙ্গভূমিরই করুণাঘন এক মাতৃমূর্ত্তি!

লাল পাড় গরদের শাড়ী পরণে। ললাটের সিন্দুর-বিন্দু ভোরের আকাশের প্রথম সূর্য্যোদয়ের মতই রক্তিম।

কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ, সোনার চুড়ি আর গরদের শাড়ী সেই রঙের সঙ্গে এক হয়ে যেন মিশে গেছে।

সুশ্রী সুন্দর মুখ। স্নেহ-গভীর আনত চোখের দৃষ্টি।

এই মায়েরই কমল কোমল চরণের তলায় লুটিয়ে পড়ে বলতে ইচ্ছে করে—'নম-নম-নম সুন্দরী মম জননী-বঙ্গভূমি—।'

বঙ্গজননীর কথা মনে করতে গেলেই অমিতের এমনি একটি মাতৃমূর্ত্তি মনের পটে ভেসে ওঠে।

প্রাণ কেমন করে চোখে জল এসে পড়ে।

ভাল করে ছবিটা বুকের মাঝে এঁকে নিতে চায় অমিতাভ। দূরে—বহু দূরে চলে গেলেও যাতে এ-ছবি না ফিকে হয়ে যায়। যেন সাত সাগরের ঢেউ লেগেও সে এই মায়েরই উপযুক্ত পুত্র হয়ে তাঁর স্নেহ-দৃষ্টির তলায় এসে আবার দাঁড়াতে পারে।

মৃদু হেসে হেমবরণী জিগ্যেস করলেন—'কিরে খোকা?'

চটে কট্ কট্ করতে করতে করুণও এসে সেখানে দাঁড়াল। তারপর চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে নাক সিটকে বলল—'ইস! তুমি এখানে-? আর আমি সারাবাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি—' বিস্মিত হয়ে হেমবরণী বললেন—

'আমায় আবার এত ভোরে তোদের কি দরকার—? অন্য দিন ত' ঘুমই ভাঙ্গে না তোদের।--আজ হল কি?'

ভাল করে ধুতির কোঁচা সামলে পকেট থেকে সুগন্ধী রুমাল বার করে নাক ঢাকা দিয়ে করুণ বলল—

'কি যে নোংরার মধ্যে থাকতে ভালবাস মাসীমা! শিগ্‌গির চল—মেসোমশাই ডাকছেন তোমাকে—।'

করুণ আর দাঁড়াল না। অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে চলে গেল। তার গমনপথের দিকে চেয়ে মৃদু হাসি ফুটে উঠল অমিতের মুখে।

এত সুখী এত বিলাসী করুণ! ডাক্তারী সে যে কেমন করেই পড়ছে!

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিরক্ত মুখে মল্লিকাও এসে দাঁড়াল। হতবুদ্ধির মত মেয়ের মুখের দিকে চাইলেন হেমবরণী।

'আজ তোদের কি হ'ল বল ত? আমি ভেবেছিলুম আমিই বুঝি ভোরে উঠেছি—কিন্তু আজ দেখছি সবারই ভোরে ওঠার পালা!'

'ভোরে উঠেছি কি আর সাধে? বাবার চিৎকারের চোটে বিছানায় শুয়ে থাকে কার সাধ্যি! শিগ্‌গির চল বাপু—। করুণদার কে আত্মীয় এসেছেন। বাবা ডাকছেন তোমাকে।'

'যাচ্ছি—যা।'

মল্লিকা চলে গেল।

এতক্ষণে অমিতাভ কথা বলল।

'তোমায় ডাকতে এসেই ভুলে গিয়েছিলুম মা। তোমার বাড়ীর আদর খাওয়া দেখছিলুম!'

হেমবরণী ভাবতে থাকেন কুড়ি বচ্ছর পরে আজ হঠাৎ করুণের আত্মীয়ের খোঁজ পড়ল কেন!

রাঙীকে খুঁটিতে বেঁধে রেখে এলেন হেমবরণী।

নবীন উৎসাহে মহীন্দর গোয়াল পরিষ্কার করে ফেলেছে ততক্ষণে। গরুর ডাবাগুলোও পরিষ্কার করে ধুয়ে এনে ছোট ছোট করে বিচালী কেটে পরিপাটি করে ছানি মেখে দিয়ে বলল—'ল্যাও—এবার হ'ল ত? আচ্ছা লবাবের বিটি হয়ে উঠেছ বাবা—! মুখে যদি কিছু রোচে!'

হো হো করে হেসে উঠল অমিতাভ।

মা'র দিকে চেয়ে বলল—'সত্যি মা—কি আস্কারাই দিচ্ছ ওদের! বেচারী মহীন্দর যে গেল!'

হেমবরণীও হাসছিলেন, বললেন—'না, মহীন্দর বেশ কাজের লোক। এইবার একবার বাছুরগুলোকে ছেড়ে দেছে বাবা মা'র কাছে। আমি যাচ্ছি।'

'দিচ্ছি মা—' বলে মহীন্দর দাঁড়িয়ে রইল।

মা চলে গেলে সে বাঁচে। একটান তামাক না খেয়ে ত' আর কোন কাজই করতে পারবে না মহীন্দর। পেট ফুলছে সেই থেকে।

হেমবরণী আর অমিতাভ চলে যেতেই হুঁকো-কলকে পেড়ে নিয়ে তামাক সাজতে বসল মহীন্দর।

মা'র দয়ার কথা কখনও কেউ ভুলবে না।

চাকরী ত অনেকেই করে কিন্তু এমন মনিব পায় কজন? তিনকুলে

কেউ নেই তার। বৌকে একাঘরে দেশে রেখে এসে কী খারাপই যে লাগত!

কত অকথা-কুকথাই না মনে হত!

নাকে চোখে কথা কয় রত্নী; ভারী চৌবালা চঞ্চলা মেয়ে, বিশ্বাস কি তাকে—?

মা তাকেও এনে কাজ দিলেন। শুধু কি কাজ —?

এবাড়ীর নীচের তলার চোর কুঠুরীটাও তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। কোণের দিকে কি নিরিবিলি ঘরখানা!

মনের আনন্দে আছে মহীন্দর রত্নীকে নিয়ে।

এমন মনিবের কাজে গাফিলতি করে ভারী অন্যায় করেছে মহীন্দর! নাঃ—কাজটা ভাল হয়নি!

হুঁকোয় গোটাকতক সুখটান দিয়ে নাক-মুখ দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে ঘাড় নেড়ে আপন মনেই বলে মহীন্দর—নাঃ—আর নয়, যা হয়ে গেছে—হয়ে গেছে—আর নয়!'

সদর রাস্তা ছেড়ে গলিপথ ধরে অমিতাভ।

বন্ধুর বাড়ী থেকে চিন্তায় মাথা বোঝাই করে সে যেতে থাকে। জমাট আড্ডায় তর্কের ঝড় উঠেছিল।

তর্ক—তর্ক আর তর্ক!

শুধু কথার ঝড়। মুখেই সব কিছু করবার ইচ্ছে—কাজে নয়।

এক একজন প্রচণ্ড তার্কিক—শিরোমণিবিশেষ।

তর্ক করে এরা সব উড়িয়ে দিতে পারে—। হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে পারে তর্ক করে।

ভাবতে ভাবতে চলে অমিত।

সেই-বা কি করছে—?

আনক আদর্শ ছিল তার—অনেক স্বপ্ন।

কাজে তার কতটুকুই-বা করতে পেরেছে—?

তাদের কলিয়ারীর কাছে ছোট্ট একটি সাঁওতাল পল্লী গড়ে তুলেছিল। সিমেণ্টের মেঝে টালি-ছাওয়া ছোট্ট ছোট্ট ঘর।

মাঝখানে বাঁধানো প্রকাণ্ড ইঁদারা।

কী খুশিই হয়েছিল সরল সাঁওতাল কুলিগুলো!

কত সামান্য দিয়েই এদের খুশি করা যায়।

কুলি-বস্তির কাছে একটি হাসপাতাল করার ইচ্ছে ছিল। রোগে-ভোগে যেন বিনা পয়সায় চিকিৎসা পায়।

কাছেই থাকবে ডাক্তারের কোয়ার্টার।

কুলিদের প্রাথমিক শিক্ষা দেবার জন্যে শুধু একটি নাইট-স্কুল করে দিয়ে আসতে পেরেছে।

প্রতিশ্রুতিও নিয়ে এসেছে সেখানকার কয়েকজন উৎসাহী তরুণের কাছে। পড়াবে তারা।

তারপর থেকে ত ওদিকে আর যাওয়াই হয়নি।

কষ্টিপাথরে খোদাই করা সাঁওতাল তরুণদের সেই বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি আর উচ্ছ্বসিত হাসির লহর মনে পড়ে যায়।

লেখাপড়া করতে হবে তাদের—? এ বাবু বলে কী!

এর চেয়ে বেশী কৌতুকের আর অদ্ভুত কথা প্রকৃতির দুলালগুলি আর কখনও শোনেনি।

প্রকৃতির পাঠশালার পড়ুয়া তারা।

প্রতি ফলফুলে, পাহাড়ে, নদীতে, তরু-তৃণদলে যে পাঠ গ্রহণ করে তারা সাবলীল, সচ্ছন্দ, সরল, অল্পে সন্তুষ্ট সদানন্দ হয়ে উঠেছে। তারপর আর কিছু জ্ঞানের কি দরকার আছে তাদের—?

মনে পড়ে যায়—সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও কেমন করে এরা সন্ধ্যেবেলা মহুয়া গাছের তলায় মাদল আর বাঁশী বাজিয়ে উৎসব আরম্ভ করে দেয়। সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষের নৃত্য-চ্ছন্দ দেহগুলি বাঁশীর ও মাদলের ঐক্যতান কোন অতীন্দ্রিয় লোকে নিয়ে যায়।

সাঁওতাল মেয়েদের কালো চিকণ শরীর থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়ে। গলায় পুঁথির মালা। হাতে কাঁচের চুড়ি আর মাথায় গোঁজা বন-কুসুমের রাশি!

সেই সুখী নর-নারীর মেলা মনে পড়ে যায়!

এরা জানে না অভাব কাকে বলে—। কোন অভিযোগ নেই এদের।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

রাজধানীর রাজপথ জনগণের কোলাহলে মুখরিত কিন্তু গলিপথ নিস্তব্ধ নির্জ্জন।

ছায়াঢাকা আঁকা বাঁকা সঙ্কীর্ণ গলিপথ দিয়ে অন্যমনস্ক হ'য়ে চলে অমিতাভ।

বিপরীত দিক থেকে একটা রিক্‌সা প্রায় তার ঘাড়ে এসে পড়ে। চমকে ওঠে অমিত।

বিরক্ত হয়ে সেই দিকে চায়। কিন্তু সমস্ত বিরক্তি তার বিস্ময়ে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়।

পাশ কাটিয়ে বার হবারও উপায় নেই সেই গলিতে বলে মনে মনে খুশিই হ'য়ে ওঠে অমিতাভ।

একটু সরে গিয়ে আরেকবার চেয়ে দেখে রিক্সার আরোহিণীর দিকে। শুভ্রবসনা সুন্দরী।

তারের যন্ত্রটা খাপে ঢাকা তার কোলের ওপর।

বীণাবাদিনী বাণীর মতই দেখায় তাকে।

মেয়েটির চোখে বিরক্তির দৃষ্টি।

অমন ভাবে চেয়ে থাকাটা সত্যিই বড় অভদ্রতা হয়ে গেছে।

অমিতাভ লজ্জিত হয়।

রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে দেয় মেয়েটি।

রিক্সাওলা চলে গেলে অমিতাভও চলতে আরম্ভ করে।

আর চেয়ে দেখবে না মনে করেও কিন্তু চেয়ে দেখে।

একটি একতলা বাড়ীর দরজার কড়া ধরে নাড়ছে মেয়েটি।

তারই দিকে চেয়েছিল। অমিত চাইতেই চোখ ফিরিয়েছিল। মুখে যেন তার কে মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দিয়েছে!

দরজা খুলে যায়—অদৃশ্য হ'য়ে যায় সে।

অমিতও আর দাঁড়ায় না।

দ্রুত চলতে থাকে।

বুকের মধ্যে তার কিসের মাতলামি সুরু হয়ে যায়।

মেয়েটির চোখে আর বিরক্তি ছিল না—কি ছিল?

মুখ তার হঠাৎ অত লাল হ'য়ে গেল কেন?

কি মনে হয় অমিতের—? রাগ না অনুরাগ—?

অনুরাগ? দূর! ভারী হাসি পায় অমিতাভের।

আজ একি পাগলামীর ভূত তার কাঁধে চাপল!

বুকের মধ্যে কিসের উন্মত্ত কলরোল এ?

এই কি তবে প্রেম—?

আর কোথাও যায় না অমিত।

সোজা বাড়ী চলে আসে।

নিজের ঘরে বিছানায় অসময়ে শুয়ে পড়ে ভাবতে থাকে—সেই অপরূপাকে।

গুন গুন করে গান করতে করতে সুসজ্জিত করুণ অমিতাভের ঘরের আয়নাওলা আলমারীটার সামনে দাঁড়াল।

কীর্ত্তন গাইছে সুকণ্ঠ করুণ।

চণ্ডীদাসের এক পদাবলী।

—'কাঞ্চনবরণী কে বটে সে ধনি ধীরে ধীরে চলি যায়
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মুরছা পায়—'

'করুণ ভাল করে গাও ত সবটা।'

চমকে উঠল করুণ।

অমিতাভ ঘরে ছিল নাকি—? দেখতে ত কই পায়নি তাকে!

বিছানায় উঠে বসেছে অমিত।

চোখেমুখে একটা খুশির জোয়ার!

বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে করুণ হেসে উঠল।

'ব্যাপার কি অমিত—?'

ধরা পড়ে গেছে নাকি! অমিত ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নেয়। আড়মোড়া ভেঙ্গে নিস্পৃহ স্বরে সে বলল,—'না—তোমার গলা আছে করুণ। গানই শিখতে হ'ত তোমাকে।'

'ডাক্তারী তুমি পড়ছ জোর করে—ও তোমার লাইন নয়।'

'ভাল লাগে না অমিত—ভাল লাগে না।' আত্মগতভাবে বলে করুণ 'হয়ত' ভুল পথেই এসেছি। কিন্তু গান?

সেকি আমাদের মত লোকের শেখা উচিত ভাই—?

গান শিখবে তোমরা। যাদের নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে দিন কাটাবার উপায় আছে। অখণ্ড অবসর আর অজস্র সচ্ছলতা ছাড়া গান হয় না।'

অমিত চুপ করে ভাবতে থাকে।

হয়ত করুণের কথাটাই সত্যি।

তারের যন্ত্র হাতে সেই পদ্মিনীর মত সুন্দরীকে মনে পড়ে যায়। নোনা ধরা বাড়ীটার দরজার কড়া ধরে যে নাড়ছিল—গরীবের মেয়েই ত মনে হয়।

সেও ত গান শেখে!

তার গান কি কোনদিন শুনতে পাবে না অমিত?

তটিনী।

তটিনী না প্রেতিনী—?

অদ্ভুত কুৎসিত মেয়েটি—কিন্তু অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী। অমন সুন্দর নামটিও যেন তার নাম হ'য়ে কুৎসিত হ'য়ে গেছে। নামের সঙ্গেই মনে পড়ে যায় নামের অধিকারিণীকে—।

মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়!

কি করেই যে মা-বাবা অমন নাম রেখেছিলেন ঐ মেয়ের!

স্নেহ যে অন্ধ—মা-বাপের কাছে ঐ হয়ত পরমা সুন্দরী!

বহু প্রতীক্ষার পর অমাবস্যার চাঁদকে পেয়েছেন তাঁরা। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান।

যখন জীবনের গতি স্তিমিত হয়ে এসেছিল, হঠাৎ বড়লোক হয়ে এই অর্থ কারো ভোগে লাগবে না ভেবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন দত্ত-দম্পতি—তখন এসেছিল সে।

আবার নতুন উদ্যম খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁরা।

মরা গাঙে ভরা জোয়ার এনে দিয়েছিল যে তার নাম তটিনী ছাড়া আর কি রাখবেন!

করুণের জীবনেও গতির স্রোত এনে দেবে মেয়েটি।

সুখের—না, সুখের না হোক স্বাচ্ছন্দ্যের জোয়ার—অর্থের জোয়ার—প্রতিপত্তির জোয়ার।

তার কুরূপ কি বাপের রূপোর চাকতিতেও ঢাকা পড়বে না? পড়বে বইকি!

কালোবাজারে টাকা করে যে স্ফীত দাম্ভিক ভদ্রলোক উপযাচক হ'য়ে করুণের কাছে প্রস্তাব করেছেন, কালোমেয়ে বলে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান করবে করুণ?

পাগল নাকি! সৌভাগ্য কি বার বার আসে—?

সানন্দে সম্মতি দেয় করুণ। বুকের ভেতরটা তার শূন্য হয়ে যায় কিন্তু মুখে ফুটে ওঠে অকৃত্রিম আনন্দের হাসি!

খুশি হন রামগতি দত্ত।

করুণের দিকে পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেন। এই রকমই একটি বন্ধনহীন সুশ্রী উৎসাহী তরুণই তিনি খুঁজছিলেন।

মেয়েকে ছেড়ে থাকতে হবে না।

বেশ চটপটে চালাক চতুর ছেলেটি। শীগ্রীই তাঁর ব্যবসা বুঝে নিতে পারবে। বেশ বিনয়ী।

মেয়ের ঔদ্ধত্যের জন্যে চিন্তিত ছিলেন তিনি—না, এ মানিয়ে নিতে পারবে। 'টিনি' সুখী হবে।

রিভলভিং চেয়ারটায় একটা মোচড় দিয়ে করুণের দিকে ফিরে বসেন মিঃ দত্ত।

মোটা বর্ম্মা চুরুটটা দাঁতে চেপে বলেন,—'তাহলে—'

করুণ বলল,—'একবার আমার মাসীমা আর মেসোমশাইকে বলতে হবে।'

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন রামগতি দত্ত। 'তোমার অভিভাবক কেউ আছেন নাকি? জানতাম না ত'!'

ভ্রূকুটি দেখা দেয় তাঁর ললাটে।

'না, অভিভাবক কেউ নেই। তবু সেইখানেই ত আমি বড় হয়েছি। তাঁদের একবার বলতে হবে।'

'হুঁ।' চিন্তিতভাবে কয়েকবার চুরুটটায় টান দেন রামগতি দত্ত। তারপর প্রশ্ন করেন—'কি নাম তোমার মেসোমশাইয়ের—?'

নামটা শুনে অপ্রসন্ন ভাব চলে যায়।

না—এমন নামকরা একজন লোকের কাছে মত নেওয়া কিছু অসম্মানজনক নয়।

হাসিমুখে উঠে পড়ে বলেন—'চল আমিও যাই তোমার সঙ্গে। অনুমতি নিয়ে আসি।'

দামী চকোলেট রঙের গাড়ীখানা নিঃশব্দে গাড়ীবারান্দার তলায়

এসে দাঁড়াতেই, বৈঠকখানা থেকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সতীশবাবু বেরিয়ে এলেন।

আলাপ না থাকলেও মিঃ দত্তকে তিনি চেনেন।

তাঁর সঙ্গে করুণকে নামতে দেখে বিস্মিত হন।

সাদরে অভ্যর্থনা করে রামগতি দত্তকে বাইরের ঘরে বসান। করুণও তাঁর পাশেই বসে পড়ে। ঈষৎ সলজ্জ হাসি তার মুখে। উত্তরোত্তর বিস্মিত হন সতীশবাবু।

কি ব্যাপার—? ব্যাপারটা খানিক পরেই পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নাঃ—ছেলেটার পাতা চাপা কপাল!

লেখাপড়া ছাড়া—আর সব বিষয়েই কেমন চালাক চতুর!

চমৎকার একটি শ্বশুর বাগিয়েছে!

যত বিস্মিত হন—তত আনন্দিতও হ'ন সতীশবাবু।

সোরগোল আরম্ভ করে দেন।

'নিশ্চয়—নিশ্চয়—বিলক্ষণ! এতে আমার খুব সম্মতি আছে। করুণ তুমি একবার বাড়ীর ভেতর যাও। তোমার মাসীমাকে বল ভাল করে মিষ্টি মুখের বন্দোবস্ত করতে। বেয়াই এসেছেন—ওরে কে আছিস—?'

করুণ স্মিতমুখে উঠে চলে যায়।

এখন আর সে কারু অনুগ্রহ অনুকম্পার ভিখারী নয়! মেসো-মশায়ের কাছে অপরাধীর মত অপ্রস্তুতভাবেই থাকতে হয়েছে তাকে!

এবছর সে পাশ করতে পারেনি বলে এ লজ্জা তার বেড়েই গিয়েছিল। বিরক্তও হয়েছিলেন ইদানীং তিনি।

করুণের কাকার প্রস্তাবে সে সম্মত হ'তে পারেনি বলে। আজ আর সে বিরক্তি নেই।

হয়ত খানিকটা সম্ভ্রমই এসেছে তাঁর মনে।

অর্থের মহিমা এমনিই!

কাকার প্রস্তাবে সে মত দিতে পারেনি। করুণের উপকার করতে এসেছিলেন না নিজের উপকার করতে এসেছিলেন ভদ্রলোক—?

পাড়াগাঁয়ের এক ডাক্তার মারা গেছেন। বড় ডিস্‌পেন্‌সারী তাঁর। ছেলেরা সব নাবালক।

করুণ যদি সেখানে বসে প্র্যাকটিশ করে—তাঁর সমস্ত প্র্যাকটিশটাই পাবে। ওষুধ বিক্রীর টাকারও কিছু সে পাবে।

লোভনীয় প্রস্তাব! মেসোমশাইয়ের তাই নাকি মনে হয়েছিল। সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে করুণ তার বিরাগভাজন হয়েছিল।

বাকী একটি কথা উহ্য ছিল কাকার প্রস্তাবে সেটি করুণের কাছে আগেই ধরা পড়েছিল।

কাকার হাঁপানী ধরেছে। সংসারটিও বিরাট।

করুণ যখন তাঁদেরই বংশধর—তখন সংসারের বোঝাটাও ত তারই বহন করা উচিত!

আশ্চর্য! কী করেই যে সতীশবাবু আশা করেছিলেন করুণ ঐ নোংরা পাড়াগাঁয়ে গিয়ে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে!

মাসীমার পায়ের ধূলো নিয়ে নতমুখে করুণ তাকে খবরটা জানায়।

তার চিবুকে হাত দিয়ে চুম্বন করে অস্ফুট স্বরে হেমবরণী আশীর্ব্বাদ করেন। চোখ তাঁর জলে ভরে ওঠে।

তাঁর করুণের এতদিনে স্থিতি হচ্ছে—এটা কি কম আনন্দের কথা ? চোখ মুছে তাকে পাশে বসিয়ে জিগ্যেস করেন—

'হ্যাঁরে মেয়েটিকে তুই দেখেছিস ?'

করুণের মুখে একটা ছায়া পড়ে কিন্তু হাসির ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে সে বলল,—'দেখেছি বৈকি মাসীমা !'

কেমন দেখতে আর জিগ্যেস করেন না হেমবরণী। ছেলের হাসি-মুখ দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছেন।

বড় দুঃখী সে—বড় বঞ্চিত।

রাঙা টুকটুকে বৌটির মনটিও যেন সুন্দর হয়।

প্রফুল্ল মুখে উঠে যান হেমবরণী নতুন বেয়াইয়ের অভ্যর্থনার আয়োজন করতে।

দরজাটা খুলে দিয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে কমলা বলে উঠলেন 'আহা দেখ দেখি দুপুর রোদ্দুরে এসে মুখখানা যে তোর সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠেছে! চুপ করে খানিকটা বিশ্রাম করে তবে সরবৎটা খাস ঝুমি। টেবিলের ওপর আছে।'

কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে যায় ঝুমি। নিস্তব্ধ নির্জ্জন ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

টেবিলে সযত্নে ভিজে ন্যাকড়া জড়ানো সরবৎএর গ্লাসটার দিকে তার দৃষ্টি পড়ে না।

বিছানার ওপরই এস্রাজটা পড়ে থাকে।

তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি দীর্ঘ সুঠাম তরুণের মূর্ত্তি। আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় সেই সুন্দর মুখ।

পুরুষের মুগ্ধদৃষ্টি এতদিন তার বিরক্তিই এনেছে—কিন্তু আজ একি হ'ল !

কি রকম যেন একটা ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে !

আজ প্রথম—হ্যাঁ আজই প্রথম ভাল লাগল এই মোহমুগ্ধ দৃষ্টির অভিনন্দন !

একি ব্যথা—একি আনন্দ ? বুকের মধ্যে এ কোন অজানা পথিকের পদধ্বনি !

কিছু বুঝতে পারে না ঝুমি—। সমস্ত শরীর আজ রিম্ ঝিম্ করে বাজছে স্বরবাঁধা এস্রাজটার মতই !

আর একবার কি তাকে দেখা যায় না ?

নির্জ্জন ঘরেও চমকে উঠল ঝুমি। আগুনের মতই রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ।

আরেকবার কি তাকে দেখা যায় না ? অমিতাভও ভাবে সেই কথা। প্রত্যেকদিন যায় সেই সকীর্ণ গলিপথ দিয়ে বেকার বন্ধুর বাড়ী। সদর রাস্তা ছেড়ে গলিপথেই তার বাড়ীতে পৌছবার পথ সংক্ষিপ্ত হয়—কিন্তু পাথেয় আর পায়না।

কোথাও আর দেখা যায় না সেই চাঁদমুখ।

দু'হাতে দুই থলি-ভর্ত্তি বাজার নিয়ে আসতে আসতে সোমদেববাবুর চোখে পড়ে যায় অন্যমনস্ক একটি তরুণের মুখ।

মুখখানা যেন খুবই চেনা-চেনা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চান। বিস্মৃতির কুয়াশা কেটে গিয়ে বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে স্মৃতি !

'আরে—এযে অমিত !'

চমকে ওঠে অমিত। চেয়ে দেখে অঙ্কের মাষ্টার সোমদেববাবু সহাস্যে তারই দিকে চেয়ে আছেন।

দ্রুত পায়ে তাঁর কাছে এগিয়ে আসে অমিত। সসম্ভ্রমে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে রাস্তার মাঝেই প্রণাম করে, থলি দুটো নিজের হাতে তুলে নেয়।

'মাষ্টার মশাই! আপনি কি এদিকেই থাকেন নাকি?'

'হ্যাঁ,—এই যে আমার বাড়ী।'

দ্রুত পায়ে তিনি বাড়ীর সামনে এগিয়ে এসে দরজার কড়া ধরে সজোরে নাড়েন।

অমিতের হৃদপিণ্ড বুকের মধ্যে লাফিয়ে ওঠে—। আরে, এযে সেই নোনাধরা বাড়ীটা!

কমলা দরজা খুলে দেন। প্রস্থানোদ্যত কমলাকে ডেকে সোমদেববাবু বলেন—'যাচ্ছ কোথায়? এযে আমার ছাত্র অমিত।'

বাজারের থলি দুটো নামিয়ে দিয়ে অমিত তাঁকে প্রণাম করে। ক্ষীণা এক জননী-মূর্ত্তি।

মাথায় হাত দিয়ে অস্ফুটে আশীর্ব্বাদ করেন কমলা। অমিত তাঁর দিকে চায়। প্রৌঢ়া তবুও আজও তাঁর মুখে কৈশোরের নম্র একটি সুকুমার মাধুর্য্য।

সোমদেববাবু বললেন,—'তোমায় কতদিন ত এর কথা বলেছি কমলা। অঙ্কে ভারী মাথা ছিল অমিতের। ঝুমিকে পাঠিয়ে দাও এগুলো নিয়ে যাক। আর—'

আর কিছু বলবার দরকার হয়না কমলাকে।

তিনি চলে যান জলযোগের বন্দোবস্ত করতে।

'ঝুমি—ঝুমি—'

বাইরের ঘরে তক্তাপোষটায় বসে পড়ে সোমদেববাবু মেয়েকে ডাক দেন।

ঝুমি! ভারী মিষ্টি নাম ত! সেই সুন্দরীর নাম নাকি—?

বুকের রক্ত অমিতাভের উত্তাল হয়ে ওঠে—উন্মুখ আগ্রহে সে প্রতীক্ষা করে সেই পরম ক্ষণটির জন্যে।

তবু বাইরে সহজ হবার চেষ্টা করে সে।

'—ডাকছিলে বাবা—?'

চমকে ওঠে অমিতাভ। বিস্ময় বিমুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে সেই অপরূপ আবির্ভাব!

ভেতরের দিকের দরজা দিয়ে আসতে গিয়ে তারই চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। ফ্রেমে বাঁধানো যেন একখানি ছবি। আনন্দ লজ্জা, বিস্ময়-কৌতুকে রমণীয় সেই অনিন্দ্য মুখ। অতি সাধারণ বেশভূষাও কত অসাধারণ, কী গভীর ব্যঞ্জনাময়ই না হ'য়ে উঠতে পারে বিশেষ একটি তনুলতাকে ঘিরে! সাধারণ সস্তা ছিটের ব্লাউজের সঙ্গে একটি ডুরে শাড়ী পরণে। মূর্ত্তিমতী যেন এক সঙ্গীত!

সঙ্গীত ছাড়া আর কোন উপমা মনে আসে না অমিতের। ভাষার ঐশ্বর্য্য তার ত নেই—সে ত কবি নয়। কেমন করেই বা এই বরবর্ণিনীর বর্ণনা করবে?

উঠে দাঁড়ায় অমিত।

নমস্কার করবার উপক্রম করতেই সোমদেববাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন—'আরে, ওযে আমার মেয়ে ঝুমি। ওকে আর অত খাতির

করতে হবে না,—বোস তুমি। ঝুমি, এই অমিত—অমিতাভ মিত্র। আমার প্রিয় ছাত্র।'

নমস্কার করে ঝুমি। চকিত কটাক্ষে একবার অমিতাভের মুখের দিকে চেয়ে দেখে।

অমিতাভ বুদ্ধের মতই সে মুখ প্রশান্ত—কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে কোথায় সেই করুণাঘন প্রশান্তি ?

দুটি চোখ যেন দুটি আরতি প্রদীপ ! প্রাণের মৌন অর্ঘ্য যেন নীরবে নিবেদন করছে।

সারাদেহে শিহরণ বয়ে যায় ঝুমির ! বুকের মধ্যে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ—মুখে অসহ্য উত্তাপ।

নত মুখে ঝুমি বাজারের থলি দুটো তুলে নিয়ে চলে যায়।

খানিক পরে কমলার সঙ্গে খাবারের রেকাবী হাতে করে যখন ঘরে আসে তখন অনেক সহজ হয়ে গেছে সে। অনেক সহজ হয়ে গেছে অমিতাভও।

সোমদেববাবু বেশ গল্প জমিয়েছেন।

অমিতাভ চলে গেলে কমলা বলেন,—'চমৎকার ছেলেটি। মনে হয় কতদিনের যেন পরিচিত। মুখটা যেন বড় চেনা চেনা—না ?'

'তোমারও চেনা চেনা ? তুমি আবার কোথায় ওকে আগে দেখলে ?' হেসে ওঠেন সোমদেববাবু।

গাঢ় স্বরে কমলা বলেন,—'তোমার মনে পড়ছে না—? উজলের মুখও আমার এমনিই ছিল—। বেঁচে থাকলে এত বড়টিই হত সে।'

চমকে ওঠেন সোমদেববাবু। এত দীর্ঘদিন ধরেও কমলা মনে রেখেছেন সেই শিশুর মুখ !

তাঁর মনের মধ্যে শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে এসে সে উপনীত হয়েছে। মার মনে বেঁচে আছে উজল। যেখানে কোনদিনই মৃত্যু নেই অমৃতের পুত্রদের। স্ত্রীর মুখের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে থাকেন সোমদেববাবু। বিষাদ-করুণ মুখের 'পরে অপার্থিব এক আলো এসে পড়েছে। শিশির-সিক্ত পদ্মের পাপড়ির মতই দুটি চোখ অশ্রুতে টলটলে।

মধুর একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই যেন দিনগুলো চলে যায় অমিতের। বিলাত-যাত্রার দিনও এগিয়ে আসে।

এইবার তাকে নিতান্ত নিজস্ব করে নিতে হবে।

তারপর ত সেই দুটি বৎসরের দীর্ঘ দুঃসহ বিরহ!

তা হোক—তবু সেই বিরহও রঙীন হয়ে উঠবে তারই মধুর স্মৃতিতে।

মল্লি এখানেই আছে অবশ্য; তবে তাকে জানানো চলবে না। শুনলেই হৈ চৈ আরম্ভ করে দিয়ে তাকে অপ্রস্তুত করে তুলবে ত শুধু? তার চেয়ে সমরকে জানানই ভাল।

চুপি চুপি আজই বলে আসতে হবে। সেই জানাবে বাবা-মাকে। এর পরের সব ব্যবস্থাই সমরের।

কিন্তু তার আগে কি একবার জানা উচিত নয়—তার মত আছে কিনা?

তাই কি পারা যায় কখনো? মন জানতে বাকীই-বা কি আছে আর। প্রিয়তমার চোখের ভাষাই যদি সে না পাঠ করতে পারল, তা হ'লে মিথ্যেই তার ভালবাসা!

উঠি উঠি করেও বিছানায় অগাধ আলস্যে পড়ে থাকে অমিত। চোখ বুজে নির্জ্জনে সেই মুখখানিই বুঝি ধ্যান করে।

সিঁড়িতে কার পরিচিত পায়ের শব্দ। উৎসুক চোখে অমিত দরজার দিকে চেয়ে দেখে উৎফুল্ল মুখে করুণ প্রবেশ করছে।

বেশভূষায় তার আরও পারিপাট্য। তীব্র একটা সুগন্ধে ঘর ভরে ওঠে।

'আরে—এস-এস!' উঠে বসে সাদরে আহ্বান করে অমিতাভ।

'নতুন বিয়ে ত অনেকেই করে কিন্তু এমনি করেই কি আমাদের ভুলে যেতে হয়?'

'ভুলে কি আমি একাই গেছি অমিত? কই তোমরাও ত আর ওদিক মাড়াও না!'

'তা তুমি বলতে পার ভাই। ভারী ব্যস্ত ছিলাম কদিন—' কি বলতে গিয়েও অমিতাভ চুপ করে যায়।

করুণ বলল—'হুঁ ব্যস্ত ত থাকবেই—যাত্রার দিন ত তোমারও এগিয়েই এল। আমিও লম্বা পাড়ি দিচ্ছি—। কন্টিনেণ্টাল টুরে যাচ্ছি। হয়ত তোমার আগেই রওনা হ'য়ে যাব।'

'ভারী খুশি হলুম করুণ—ভারী সুখবর। সস্ত্রীক যাচ্ছ নিশ্চয়ই? নবদম্পতির 'হনিমুন' মধুময় হোক।'

সোৎসাহে করুণের দুটো হাত ধরে জোরে জোরে ঝাঁকানি দেয় অমিতাভ।

তিক্ত একটা ব্যঙ্গ হাসি করুণের মুখে ফুটে উঠল। সে বলল—'মধু অবশ্য তার মধ্যে থাকবে কিনা জানিনা তবে পেত্নী সঙ্গেই থাকবেন।

তাঁরই ত' অনেক দিনের সাধ ইয়োরোপ ভ্রমণের। এতদিন যেতে পারেননি শুধু ভাল একটি খিদমদগারের অভাবেই।'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে অমিতাভ করুণের মুখের দিকে চেয়ে রইল। স্ত্রী কুরূপাই হয়েছে অবশ্য করুণের—কিন্তু সে ত নিজে দেখেই বিয়ে করেছে। এত মর্ম্মান্তিক ঘৃণা কেন তবে সেই মেয়েটির ওপর ?

ব্যথিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে অমিতাভ বলল—'ছিঃ করুণ! তোমার কাছে এ আমি আশা করিনি। তোমার বিবাহিতা স্ত্রী তিনি—সেটা ভুলে যেওনা।'

'সে আমি কোনদিনই ভুলিনা অমিত—কোনদিন ভুলবও না। তোমায় মনে করাতে হবে না—অহরহ আমি তা মর্ম্মেমর্ম্মে অনুভব করছি।'

তবে আমিও ত মানুষ—বন্ধুর কাছে দুটো মনের কথাও কি বলতে পাব না—?'

করুণ ত চিরকাল ভদ্র।—মনের কথা কি সত্যিই এই—বা নিষ্ঠুর আঘাতেই তার মুখ দিয়ে এই রূঢ় কথাটা বার হয়ে গেছে—?

করুণের বেদনা-ম্লান মুখের দিকে অমিত চেয়ে রইল।

করুণ বলল—'রূপ ত' বাইরের সম্পদ—ভেতরটাও যদি তার পরিষ্কার হত!'

অমিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।—কিছু প্রশ্ন করতে তার সঙ্কোচ হয়।

বিয়ের আটদিনের মধ্যেই তটিনীর এমন কি পরিচয় পেয়েছে করুণ যে সব মোহ তার ভেঙ্গে গেছে—?

ম্লান হেসে করুণ বলল—তুমি বোধ হয় অবাক হয়ে যাচ্ছ—?

আমিও কম অবাক হয়নি। এত সন্দিগ্ধ মন যে আজকালকার যুগের কোন মেয়ের থাকতে পারে এ আমার জানা ছিল না। আসিনা বলছ—কিন্তু জান কি গতিবিধি সবই আমার এরই মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে গেছে—? সঙ্গে সঙ্গে তিনি আসেন। একা কোথাও গেলেই ফিরে গিয়ে সেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হয়!'

ভারি হাসি পায় অমিতের।

একটি মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে চির সপ্রতিভ করুণ আনত দীন করুণনয়নে। ছবিটা ভারী কৌতুকের!

মুখে কিন্তু অটল গাম্ভীর্য্য বজায় রাখে অমিতাভ।

আহা! বেচারী একটু সহানুভূতির আশায় এসেছে!

'আজও তাহলে তোমায় গিয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হবে?'

একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ বলল—

'না, ভগবানকে ধন্যবাদ। আজ আর কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবেনা মনে হচ্ছে। মাথা ধরেছে— বাড়ীশুদ্ধ লোক অস্থির হ'য়ে উঠেছে—। ডাক্তার, নার্স এসে গেছেন। কৈফিয়ৎ চাইবে কে—? তবিয়ত আচ্ছা হ'লে তবে না কৈফিয়ৎ—?'

এতক্ষণে মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠল অমিতাভ!

'ধনীর দুলালী—তার চিকিৎসার জন্যে তাঁরা যদি একটু ঘটাই করেন —তোমার রাগ কেন অত? চল—চল—মার কাছে চল। মা ত তোমার জন্যে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন।'

ধরা গলায় করুণ বলল—'সে আমি জানি। তাঁর স্নেহের কথা কি কোনদিন ভুলতে পারব অমিত—? তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই ত এসেছি, কিন্তু তার আগে—'

তার হাতে মোড়া প্যাকেটটার দিকে এতক্ষণে দৃষ্টি পড়ল অমিতের। কাগজের মোড়ক খুলে করুণ বার করল একটি ফটোর এ্যালবাম আর সুদৃশ্য মলাটে বাঁধাই একটি বই।

বই আর এ্যালবামটা অমিতের হাতে দিয়ে করুণ বলল 'এই দুটো তোমার কাছে যত্ন করে রেখে দাও অমিত।'

সবিস্ময়ে অমিতাভ তার দিকে চাইল।

'কেন বলত'—? 'মেঘদূত'—এযে দেখছি তোমার স্ত্রীকে কে উপহার দিয়েছেন।—এখানে রাখবে কেন—?'

'তাও বুঝলে না অমিত—? নাঃ—তুমি দেখছি নেহাৎ নাবালক! দিয়েছেন যে আমার এক বান্ধবী। বইটা কি আমার হৃদয়েশ্বরী এখনও দেখেছেন—? ভাগ্যিস দেখেননি! দেখলে যে কি হ'ত—ভাবতেও আমার হৃদ্‌কম্প হচ্ছে।—আর এ্যালবামটা—হ্যাঁ আমার কুমার জীবনের সাধ আর আকাঙ্খার ছবি এগুলো। এরও কদর্থ হতে পারে। সাধ করে কে আর অশান্তি আনতে চায় বল—? তোমার কাছে রেখে দাও—দেখো ঘুণাক্ষরেও যেন তিনি না টের পান!'

অমিতাভ 'মেঘদূতের' উপহার-পৃষ্ঠার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে থাকে। লাল কালীতে মুক্তার মত অক্ষরে লেখা—'করুণ ও তটিনী বোসের শুভবিবাহে—' নীচে নাম সই—'নীরা'!

করুণের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে তার ব্যথিত মুখের দিকে চেয়ে অমিত প্রশ্ন করল—'কে এই মেয়েটি—করুণ?'

'আমার স্বপ্ন!'

চমকে উঠে করুণের মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে অমিতাভ বলল—'তুমি কি তাকে ভালবাসতে—?'

'বাসতাম নয়—এখনও বাসি।'

'তবে—তাকেই বিয়ে করলেনা কেন—?'

তিক্ত হেসে করুণ বলল 'এই বিংশ শতাব্দীর অভিশাপ—যাকে ভালবাসা যায়—তাকে বিয়ে করা যায় না। যাকে বিয়ে করি তাকে ভালবাসতে পারিনা।—যাক্‌গে ভাই—যাচ্ছি আমি মাসীমার কাছে। তুমি ওদুটো তুলে রেখে এস।'

অমিতাভ অন্যমনস্ক হ'য়ে বসে থাকে।

এই কি বিংশ শতাব্দীর অভিশাপ—?

যাক—ভগবানকে ধন্যবাদ।

বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সুবিধাবাদী প্রগতিপন্থী তরুণ হবার তার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই।

সে সৌভাগ্যমান। যাকে সে ভালবাসে—তাকেই বিয়ে করবে। যাকে বিয়ে করবে—তাকেই ভালবাসবে আজীবন।

আলমারী খুলে সযত্নে তুলে রাখে অমিতাভ ফটোর এ্যালবাম আর 'মেঘদূত'।

তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিরহ-বিধুর একটি পরিম্লান মুখের ছবি—যার আর করুণের মাঝখানে বইছে—দুস্তর এক অশ্রুর সমুদ্র!

অনেক দিন পরে ভাইকে দেখে সুহাসিনী খুশিতে উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন।

'ওমা—মানিক! আয়—আয়—কতদিন পরে এলি বল ত? পথ ভুলে নাকি!'

ঘরে প্রবেশ করল একজন সুন্দর নধরকান্তি তরুণ। সিল্কের পাঞ্জাবীতে হীরের বোতাম—জরীপাড় দামী ধুতির কোঁচা মেঝেয় লুটচ্ছে। জরীপাড় শান্তিপুরী সাদা চাদরটাও অবহেলাভরে বাঁ কাঁধের ওপর থেকে মাটি পর্য্যন্ত বিলম্বিত। বাঁ হাতের অনামিকায় একটি বড় হীরের আংটী। পায়ে শুঁড় তোলা লাল টুকটুকে বিদ্যাসাগরী চটি। কুঞ্চিত চুল শুধু সযত্নে অবিন্যস্ত। চোখে কেমন উদাস দৃষ্টি!

সহাস্যে ঘরে প্রবেশ করে নরম সোফার মধ্যে ডুবে গেল সে। তারপর ফুলদানী থেকে রজনীগন্ধা একগুচ্ছ তুলে শুঁকতে শুঁকতে বলল—'ক্রমশঃ প্রকাশ্য। দাঁড়াও—একে একে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি ছোড়দি—তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। ডলী কোথায়? মিহির—শিশির—জহর কোথায়?'

ভাইকে ভাগ্নী, ভাগ্নের খোঁজ নিতে দেখে সুহাসিনী পুলকিত হয়ে উঠলেন।

ভাইয়ের পাশে এসে বসে তিনি বললেন—'ডলী ত শ্বশুরবাড়ীতে আর মিহির-শিশির-জহর গেছে ওঁর সঙ্গে বেড়াতে। তারপর—তোর খবর কি বল ত? নতুন কি কবিতার বই লিখলি?'

ভাইটির জন্যে গর্ব্বে বুক ভরে ওঠে সুহাসিনীর। তাদের সাত বোনের ঐ একটি মোটে ভাই—সাত রাজার ধন এক মানিক!

লেখাপড়ায় অনুরাগ নেই তা নয়—তবে বাঁধাধরা বিদ্যে তার পোশায় না।

কবিমাত্রেই যেমন পাশ করা বিদ্যের ওপর কোন আস্থা রাখে না—মানিকও ঠিক তাই।

তবু কলেজে সে পড়ে—বৈচিত্র্যের জন্যে। ভারী খামখেয়ালী।

বছর বছর কলেজ বদলায়। বছর দুই হ'ল স্কটিশে ভর্ত্তি হয়েছে—আর কলেজ বদলায়নি। এবার ত আই. এ. পরীক্ষা—পাশ করতে পারবে কিনা কে জানে!

না পারুক—লেখাপড়ার সে রীতিমত চর্চ্চা রাখে। পাশকরা বিদ্যের তার দরকারই বা কি? চাকরী করতে হবেনা ত' কোনদিনই। ডিগ্রীর মোহ যদি না থাকে—সেত ভালই। এই বয়সেই একটা গদ্য কবিতার বই তার প্রকাশিত হয়ে গেছে। নাম হয়নি অবশ্য,—তা না হোক।

বাংলাদেশে সত্যিকারের সাহিত্য-রসিক ক'জনই বা আছে—যে তার মর্ম্ম বুঝবে? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই একদিন দেশের লোক বুঝতে পারেনি। শুধু বুঝতে পারেনি নয়—নির্ম্মম ব্যঙ্গ করেছে!

সে সব সুহাসিনী গ্রাহ্য করেন না।

তবে শুভেন্দুবাবু যখন বলেন গদ্য কবিতা লেখা খুব সোজা—কতকগুলো দুর্ব্বোধ্য কথা সাজিয়ে দুপাশ রবার দিয়ে মুছে দিলেই চমৎকার গদ্য কবিতা হয়ে যায়—তখন সুহাসিনী আর সহ্য করতে পারেন না।

এই কথায় সেদিন তাঁদের ঝগড়া হয়ে কথা বন্ধ ছিল দু'দিন। অবশেষে শুভেন্দুবাবুই সন্ধি করেছেন।

তিনি নাকি ঠাট্টা করেছিলেন—আসলে মানিক চমৎকার লেখে।

কিন্তু সুহাসিনী তাঁর মুখের হাসি, তাঁর কথা বলবার সুরে সন্দিগ্ধ হয়েছেন—এখনও যেন তিনি ঠাট্টা করছেন—সেদিন তাই তাঁর মনে হয়েছিল।

হতাশভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মানিক বললে—'আর কবিতা! মন ভাল থাকলে তবে ত কবিতা লিখব ছোড়দি?'

'মন। মন কেন ভাল নেই তোর বল দেখি—কি হয়েছে?'

উৎকণ্ঠিত হ'য়ে সুহাসিনী ভাইয়ের মুখের দিকে চাইলেন।

মিনে-করা সোনার সিগার-কেস বার করে একটা সিগারেট বার করল মানিক—তারপর সেটা ধরিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচনা করতে লাগল।

সুহাসিনী অধৈর্য্য হয়ে বলে উঠলেন—'কি হয়েছে—বল তাই? একা থাকিস—বাবা মা নেই—দেখবার ত কেউ নেই। শরীর ভাল আছে ত?'

'শরীর?' উদাস চোখে দেওয়ালের দিকে চেয়ে মানিক বলল, 'না—শরীর ত বেশ ভালই আছে—কিন্তু—'

'কি হয়েছে রে—বলনা। আমার কাছে আবার লজ্জা কি?'

উদ্‌গ্রীব হ'য়ে সুহাসিনী ভাইয়ের মুখের দিকে চাইলেন। কবি মানুষ—বলা যায়না হয়ত' কোন অঘটন ঘটিয়ে বসে আছে। অগনন বান্ধবীর মধ্যে কোনটিকে তার মনে ধরেছে—কে জানে!

'না লজ্জা আর কি!' সিগারেটটা এ্যাস্‌-ট্রের ওপর নামিয়ে রেখে দিদির দিকে ফিরে বলল মানিক।

মৃদু হেসে বলল—'সত্যি ছোটদি—তোমায় এর একটা উপায় করতে হবেই ভাই—নাহলে আমি—আমি যে কী করব ভাবতে পারি না।'

হেসে উঠলেন সুহাসিনী। বললেন—'আগে খুলেই বল—তবে ত'

উৎসুক দৃষ্টিতে সুহাসিনীর দিকে চেয়ে মানিক বলল,—'ডলির বিয়েতেই তাকে প্রথম দেখি। সে ত তোমাদেরই আত্মীয় ছোটদি। কি যেন নাম মেয়েটির—নাঃ, নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। আশ্চর্য্য সুন্দর কিন্তু!'

ঈর্ষা-বিবর্ণ মুখে সুহাসিনী ভাইয়ের মুখের দিকে চাইলেন। এতটা তিনি ভাবতেও পারেন নি। রূপসী ঝুমি তাঁর ভাইয়ের মনেও তুফান তুলেছে!

একটুও খুশি হতে পারেন না একথা শুনে।

বিরাট জমিদারীর মালিক একজন দীনহীন স্কুল-মাষ্টারের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে—এটা তাঁর চোখে অতি দৃষ্টিকটু লাগল।

কত বড় বড় ঘরের সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে সম্বন্ধ আসছে যার—তার একি প্রবৃত্তি!

ভাইকে যতই ভালবাসুন—তার এ খেয়ালের কিছুতেই সমর্থন করতে পারবেন না সুহাসিনী।

তেতো ওষুধ গেলার মত মুখ বিকৃত করে তিনি বললেন—'অবাক করলি মানিক! ধন্যি তোর পছন্দ যাহোক। এত বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ের সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়ে শেষে কিনা ওকেই তোর পছন্দ হোল—যার বাপ সামান্য একজন ইস্কুল-মাষ্টার!'

সুহাসিনীর অপ্রসন্ন মুখের দিকে একবার চকিত কটাক্ষে চেয়ে মানিক বলল—'আহা! বাপ স্কুল-মাষ্টার ত কি হয়েছে—তাকে ত আর আমি বিয়ে করছি না!'

ভাইয়ের এতবড় রসিকতাও কিন্তু সুহাসিনীকে হাসাতে পারলে না।

গভীর অবজ্ঞায় তিনি বললেন—'কত বড় বংশ আমাদের—যার তার ঘরের মেয়ে আনলে কি চলে—? শত্রু হাসানো হয় শুধু। যতই সুন্দরী হোক—বংশ গৌরব যে নেই একেবারেই।'

বাবা মা আজ নেই বলেই না তোর এত সাহস!'

উদ্ধতভাবে মানিক বলল—সাহস! সাহসের কথা কি বলছ দিদি—তাঁরা থাকলেও আমার সাহসের অভাব হত না। কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বলেই না তোমার কাছে এসেছি—? তুমি যদি কোন উপায় করতে পার ত বল—না হলে উঠি।'

বিধাতার একি নির্ম্মম পরিহাস।

যে মেয়েটাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করেন—তাকেই কিনা পরমাত্মীয়া বলে গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু একি হেঁয়ালী করে কথা বলছে মানিক!

ঝুমিকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়?

বিয়ের প্রস্তাব শুনলেই যে সোমদেববাবু আর কমলা হাতে স্বর্গ পাবেন!

সুহাসিনী সবিস্ময়ে বললেন—'তুই কি যে বলছিস মানিক কিছু বুঝতে পারছি না আমি—। বেশ ত—বিয়ে করবি ঘটক পাঠা না? আমায় ধরবার কি দরকার? এক্ষুনি বিয়ে দেবে ওরা—কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখানো! আমি কি উপায় করব—তোর একটা ইঙ্গিতই ত যথেষ্ট।'

হতাশভাবে মাথার চুলগুলো আরো এলোমেলো করতে করতে মানিক বলল—'অত সোজা নয় দিদি—অত সোজা নয়। সোমদেব

বাবুকে তুমি চেন না—একটি চিজ্। আমি ঘটক কি আর পাঠাইনি ভেবেছ? তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

'ফিরিয়ে দিয়েছেন!' স্থহাসিনী নিজের শ্রবণশক্তির ওপরও যেন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন।

অপমানে লজ্জায় তাঁর গৌরমুখ রাঙা হয়ে উঠল। তীব্র স্বরে তিনি বললেন—'ছিঃ ছিঃ,—এও শেষে শুনতে হল? তাও তুই ঐ মেয়েকেই বিয়ে করতে চাস—? অপমানবোধও কি তোর নেই মানিক—?'

'আর অপমান বোধ!' তপ্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মানিক বলল—'আমাতে কি আর আমিই আছি ছোটদি! জামাইবাবু যদি একবার বলেন তা হলে বোধ হয় সোমদেববাবু ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। তোমায় একাজটা করতেই হবে—লক্ষ্মিটি।'

সেই মোহিনী রাক্ষুসী মেয়েটার ওপর রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে স্থহাসিনীর—কিন্তু ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে ভারী মায়াও হয়।

সংশয়পীড়িত চোখে মানিকের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'কিন্তু যদি ওঁর কথাতেও ওরা বিয়ে না দেয়?'

'না—না—ওকথা বোলনা ছোটদি।' আর্ত্তনাদ করে উঠল মানিক, 'দোহাই তোমার ছোটদি এটা তোমায় করতেই হবে—না হ'লে আমি আত্মহত্যা করব।'

ভয়ের একটা তীব্র শিহরণ বয়ে গেল স্থহাসিনীর সর্ব্বাঙ্গে। জল ভরা চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বেদনার্ত্ত কণ্ঠে তিনি বললেন—'মানিক!'

অনেক বুঝিয়ে অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে, নিজেও আশ্বাস আর

প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে ভাইকে বাড়ী যেতে দিলেন সুহাসিনী। তবুও ভয়ে তাঁর গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। কি ভয়ঙ্কর কথাই না আজ মানিক বলল!

বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে অসাড় নিস্পন্দ হয়ে তিনি বসে রইলেন।

শুভেন্দুবাবু বাড়ী এসে সুহাসিনীকে অমন ভাবে বসে থাকতে দেখে চমকে উঠলেন।

হাজার বিরক্তিতেও যার ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে—তার মুখ আজ এত অন্ধকার কেন?

স্ত্রীর কাছে সব শুনে শুভেন্দুবাবু তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। প্রবোধ দিয়ে বললেন—'আত্মহত্যা মানিক করতে যাবে কি দুঃখে? সে কি আর অত বোকা যে হঠাৎ একটা পাগলামী করে বসবে? এ শুধু তোমায় মিছিমিছি ভয় দেখিয়েছে—পাছে অমত করো। কিছু ভেব না—আমি যাব বলতে। বিনা পয়সায় এমন সম্বন্ধ! এ বিয়ে হবেই—ধরে নাও। ঘটকের কথা হয়ত বিশ্বাসই করতে পারেন নি—তাই ফিরিয়ে দিয়েছেন। না হ'লে এত গাধা একজন স্কুলমাষ্টারও এ যুগে হতে পারে আমার বিশ্বাস হয় না!

'হাতের লক্ষ্মী কেউ পায় ঠেলে? মেয়েটার কপাল ভাল বলতে হবে।'

সুহাসিনীর মনের মেঘ কেটে গিয়ে আবার মুখে হাসি ফুটে উঠল কিন্তু বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ একটা কাঁটা বিঁধেই রইল।

তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্যে মানিকের একি পাগলামী? কত বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ এসে যার ফিরে যাচ্ছে—সে কিনা আঁস্তাকুড় থেকে পদ্ম তোলবার জন্যে লালায়িত!

তাঁদের বংশে এরকম অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার এর আগে কখনও আর হয় নি।

পাত্রীপক্ষই দুয়ারে এসেছে পাত্র কখনই যায় নি ভিক্ষা জানিয়ে।

মানিকের অবিবেচনায় সুহাসিনী অপমানিত বোধ করেন। স্বামীর অকৃত্রিম আনন্দ তাঁকে আহতই করে রীতিমত। মানিকের যোগ্য কি ঝুমি—?

করুণ গিয়ে হেমবরণীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি—চমকে উঠলেন।

করুণকে দেখে তাঁর মুখ স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সস্নেহে চিবুকে হাত দিয়ে চুম্বন করে বললেন—'কে করুণ—? আয় বাবা—আয়।'

নিজের ঘরে নিয়ে এলেন তাকে। তাঁর পাশে করুণও খাটে বসল।

অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে হেমবরণী তার মুখের দিকে চাইলেন। তার মুখে বিপদের ম্লান ছায়া।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন হেমবরণী।

সহজাত মাতৃহৃদয় দিয়েই তিনি অনুভব করেছিলেন করুণ এ বিয়েতে সুখী হয়নি। স্ত্রী রূপসী হয়নি তার—কিন্তু সেজন্যে কি এই দুঃখ? তাত' মনে হয়না, সে নিজে দেখেই বিয়ে করেছে—। তবে কি মেয়েটির মনটি ও তার চেহারার মতই—?

সস্নেহে করুণের পিঠে মাথায় হাত বুলতে বুলতে হেমবরণী বললেন—'অমিত ত' এই কদিন বাদেই রওনা হবে—। তুই ও কতদূরে চলে গেলি—আমি কি একাই পড়ে গেছি করুণ! মল্লি তাইত'

গেল না। সময় নিতে এসেও ফিরে গেল। কিন্তু কদিন আর আমি ওকে আটকাব? নিজের সংসার ছেড়ে আমার কাছে পড়ে থাকবে—এ আমিও চাইনা। মেয়েত' পরেরই জন্যে—যাক কদিন তারপর পাঠিয়ে দেব।'

মল্লিকা ঘরে ঢুকে সহাস্যে বলল—'এই যে করুণাদা কখন এলে? বৌদিকে আনলে না যে—?'

মৃদু হেসে করুণ বলল—'তিনি আসবেন কি করে—অসুখ হয়েছে যে!'

উৎকণ্ঠিত হয়ে হেমবরণী বললেন—'আহা তাই নাকি! কি হ'য়েছে-রে—?'

'কিছু এমন হয়নি মাসীমা। মাথা ধরেছে শুধু—তুমি ভেবনা।' উদ্বিগ্ন স্বরেই আবার হেমবরণী বললেন—'নিশ্চয়ই খুব বেশীই ধরেছে—?'

উদাসভাবে করুণ বলল—'হতে পারে। অন্ততঃ—রকম সকম দেখে তাইত' মনে হচ্ছে!'

মিটি মিটি হেসে মল্লিকা বলল—'করুণাদা যে দেখছি—বিয়ের পর একেবারে বৈরাগী হয়ে উঠলে!'

পকেট থেকে সুগন্ধী রুমাল বার করে আলতোভাবে ঘাড় গলা কপালের ওপর বুলিয়ে নিয়ে সহাস্যে করুণ বলল—'বৈরাগ্যের কি দেখলি? আমায় দেখে কি বৈরাগ্য এসেছে বলে মনে হচ্ছে—?'

সতীশবাবুর ঈজি চেয়ারটায় অর্দ্ধশায়িত হয়ে মল্লিকা বসেছিল। চকিত কটাক্ষে একবার করুণের দিকে চেয়ে সে বলল—'তা' অবশ্য তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছেনা—তবে গলাটা কেমন উদাস-উদাস! বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করেছ বুঝি—?'

সোৎসাহে করুণ বলল—'ঠিক বলেছিস! তুইত' বেশ অভিজ্ঞ হ'য়ে উঠেছিস দেখছি—কি করে বুঝলি—? সমরের সঙ্গে তোর যখন ঝগড়া হয়—তখন বুঝি তার গলার স্বর অমনি উদাস-উদাস না কি যেন বলছিলি—সেই রকম হ'য়ে যায়—?'

রাঙা মুখে মল্লিকা বলল—'দেখছ মা—একদণ্ডের জন্যে এসেও আমার সঙ্গে লাগছে। বিয়ে করে একেবারে গোল্লায় গেছে!'

'ভারী মুস্কিলে ফেললি মল্লি!' কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ বলল—'তাহলে কি হলে ছেলেরা শুধরতে পারে বলত' ভাই—? বিয়ে না দিলে 'বকে' যাবার ভয় থাকে—আবার বিয়ে করলেও গোল্লায় যায়!'

হেমবরণী হাসছিলেন।

ঝগড়াটা থামাবার জন্যে তিনি বললেন—'যা মল্লি করুণের জন্যে খাবার নিয়ে আয়।'

করুণের কথা শুনে আর নাটকীয় ভঙ্গী দেখে ভারী হাসি পাচ্ছিল মল্লিকার।

হাসি লুকোবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

খাবারের মস্ত বড় রেকাবী সাজিয়ে মল্লিকা প্রবেশ করল। অমিতাভও তার সঙ্গে সঙ্গে এসে মা'র পাশে বসে পড়ল।

জলখাবারের রেকাবী আর জলের গ্লাস করুণের দুহাতে ধরিয়ে দিয়ে মল্লিকা আবার ঈজি চেয়ারটাতেই বসে পড়ল।

জলখাবারের বিরাট আয়োজনের দিকে চেয়ে আঁতকে উঠে করুণ বলল—'একি করেছিস মল্লি—আমি খেয়ে এসেছি যে। এত কখনও খেতে পারি?'

অমিতাভ মল্লিকার মুখের দিকে চেয়ে করুণকে বলল—'বিনা বাক্য ব্যয়ে খাও করুণ। নাহ'লে 'মল্লিনাথের টিপ্পনি'—জানত'?'

'তা আর জানিনা!' একটা বড় রসোগোল্লায় কামড় দিয়ে করুণ বলল—'টিকা নিষ্প্রয়োজন। এস অমিত দুজনে ভাগাভাগি করে খেয়েনি—মল্লি কিরকম চটে আছে দেখছত'?'

মৃদু হেসে মল্লিকা বলল—'হুঁ—টিকাটিপ্পনি যাই বলনা কেন—তোমাদের কাছেত' আমি আনাড়ী—। দশবছর এখন তোমাদের কাছে শিখতে হবে!'

অমিত ও করুণ অপরিমিত হাসতে লাগল।

হেমবরণী সায় দিয়ে বললেন—'তা' মিথ্যে নয় বাবু। একটা মোটে বোন তোদের—তবু দুজনে সর্ব্বদা ওকে জ্বালাচ্ছিস। যাকগে ওসব কথা। বৌমা ভাল হলে একদিন নিয়ে আসিস করুণ—আমিও যাব একদিন।'

অমিতাভ বলল—'হ্যাঁ একদিন নিয়ে এস করুণ বৌদিকে—ভালকরে আলাপ করাই হয়নি তাঁর সঙ্গে। এরপর আবার দুজনেত' লম্বাপাড়ি দিচ্ছ—কতদিন আবার দেখা হবেনা।'

বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করলেন হেমবরণী—'করুণ তোরা আবার কোথায় যাচ্ছিস?'

কৌতূহলে মল্লিকার চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল। সত্যি করুণদার কপাল বলতে হবে! যা চাইছিল ঠিক তাই-ই পেয়েছে! শুধু মধুর সঙ্গে হুলের মত বউটি না হ'ত!

একদিনের জন্যে বৌভাতের নিমন্ত্রণে গিয়ে মল্লিকা তার সম্বন্ধে বিশেষ ভাল ধারণা নিয়ে আসতে পারেনি।

অহঙ্কার কথায় কথায় ফুটে বেরুচ্ছিল তার মা বাবার কিন্তু মেয়েটি যেন তাদেরও ছাড়িয়ে গেছে!

মল্লিকা প্রশ্ন করল—'সত্যি কোথায় যাচ্ছ ভাই করুণদা ?'

প্রদীপ্ত মুখে করুণ বলল—'গোটা ইয়োরোপটাই বেড়িয়ে আসব বুঝলি মল্লি ? কতদিনে যে ফিরতে পারব কি জানি !'

'বৌদিও সঙ্গে যাবে নিশ্চয় ?'

'বলা—বাহুল্য।'

হেমবরণীর মুখে একটা ম্লানছায়া ভেসে আসে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—'তোরা তাহ'লে দুজনেই দূরে চললি ? ভাগ্যিস তবু মল্লির কাছে বিয়ে হয়েছে। ইচ্ছেমত সেও আসতে পারবে—আমিও যেতে পারব। যাইহোক—ভালয় ভালয় বেড়িয়ে আয় সব।'

অমিতাভ হেসে উঠল।

'আমার কিন্তু সখের সফরে যাওয়া নয় মা—রীতিমত খাটতে যাচ্ছি আমি।'

'সেকি আর জানিনা খোকা ?' ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে সজল চোখে হেমবরণী বললেন—'দেখিস বাপু—বেশী খেটে শরীর যেন পাত করে ফেলিসনা তাবলে। এমনিইত' কদিনে যেন একটু রোগা হ'য়ে গেছিস !'

অমিতাভ তার পেশীবহুল সুঠাম দেহের দিকে চেয়ে হেসে বলল—'ও তোমার চোখের ভুল মা !'

করুণ উঠে বলল—'আমি তাহ'লে যাই মাসীমা। যাবার আগে আবার একদিন আসব।'

অস্ফুটে হেমবরণী বললেন—'আয়।'

করুণ ঘর ছেড়ে বেরুবার উপক্রম করতেই তীরের মতই সবেগে টুলু এসে ঢুকল।

সব সময় রত্নীর কাছে বন্দী থেকে থেকে ফাঁক পেলেই টুলু তার দিদিমণির কাছে পালিয়ে আসে।

হেমবরণীর কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলল—'দি'মণি শোন—পেত্নী না—?' তার অসমাপ্ত কথাতেই ঘরের মধ্যে হাসির রোল উঠল বটে তবু টুলু দমলনা।

বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে হেমবরণীর দিকে চেয়ে তর্জ্জনীটা মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে, চোখমুখের বিশেষ একটা ভঙ্গী করে টুলু বলল—'পেত্নী না—পানের সঙ্গে এতটা নুন্ খেল!'

পানের সঙ্গে 'নুন' খাওয়ার বিশেষ ভঙ্গীটাও টুলু দেখাতে ভুলল না।

হাসির অট্টরোল উঠল ঘরের মধ্যে।

মল্লিকা হেসে লুটিয়ে পড়ল। হাসতে হাসতেই বলল—'ওমা! সব ভুলে গেছে! রত্নীর বদলে পেত্নী—আর পানের চুণের বদলে নুন!' যাই বাবাকে মজার খবরটা দিয়ে আসি। মল্লিকা ছুটে চলে গেল সতীশবাবুর কাছে।

অমিতাভ টুলুকে লুফতে লাগল।

হাসতে হাসতে বলল—'ঠিক কথা বলেছে টুলু—। পেত্নীরা কি পানে চুণ খায়—নুন দিয়েইত' পান খায় তারা—কি বল টুলুবাবু—?'

ডাকাত ছেলে। অমিতাভ যত উঁচুতে লোফে ততই খুসীতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে টুলু।

টুলুকে দেখলেই মনে পড়ে যায় সমরের কথা।

বাপের মতই বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মুখ—। তেমনিই প্রাণবন্ত উচ্ছল ছেলেটা !

মার কোলে তাকে নামিয়ে দিয়ে অভিতাভও বেরিয়ে পড়ল। সমরকে আজই বলতে হবে।

উৎসুক হয়ে থাকে ঝুমি।

অমিতাভর আসার ক্ষণটির জন্যে যেন তার মনপ্রাণ উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

এক একটি দিন যেন এক একটি সুগন্ধ রঙীন ফুলের মতই বিকশিত হয়ে ওঠে.। স্বপ্নের মত মধুর মনোরম এই দিনগুলি ! কমলা তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে নেন।

ঝুমিও কলেজ থেকে ফিরেই মা'র সঙ্গে কাজে লাগে। যাতে অমিতাভ এলে সেও মা বাবার সঙ্গে সেখানে গিয়ে বসতে পারে।

তবু অমিতাভর কি আর সময় অসময় আছে !

এসে পড়ে মাঝে মাঝে অসময়েই।

যেখানে মা আর মেয়ে রান্নাঘরে কাজ সারতে ব্যস্ত সেইখানেই বারান্দায় পিঁড়ি পেতে বসে পড়ে।

কত দিনের যেন পরিচিত তাদের !

কমলা কত বারণ করেন গরমে বসতে—হেসে উড়িয়ে দেয় সে !

এত অমায়িক এত অনাড়ম্বর তার আচরণ—কোন কুণ্ঠাই আসেনা কমলার।

ভারী ভাল লাগে এই আপনভোলা ছেলেটিকে।

একটা অস্পষ্ট কামনাও মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হ'য়ে ওঠে কিন্তু ভীরু

কমলার ভাল করে সে কথা মনে জাগতেও সাহস করেনা। কিন্তু বুকের অনেকখানিই যে অমিতাভ তাঁর জুড়ে বসেছে সেকথা অস্বীকার করা যায়না।

ছেলের জন্যে যে আসনটা তাঁর এতদিন শূন্য পড়ে ছিল—সেই ফাঁকা জায়গাটাই যেন ভরাট হয়ে আসে।

কাজকর্ম্ম তাড়াতাড়ি সেরে এসে ঝুমি বাক্স খুলে বার করল লাল টুকটুকে মুগাপাড় তাঁতের শাড়ীটা।

ঘোর লাল রঙের একটা ব্লাউজও বার করল—কাঁধ থেকে হাতের শেষ পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম কাজ করেছে নিজের হাতে সোনালী রেশমের—কাজের জন্যে সুতী জামাটাই হয়ে উঠেছে একটা দামী জিনিষ। জামাকাপড় নিয়ে কতক্ষণ ঝুমি বসে রইল।

রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ।

বাবা কিনে দিয়েছিলেন সখ করে শাড়ীখানা।

তাঁর ফুটফুটে মেয়েকে টুকটুকে শাড়ীতে নাকি ভারী মানাবে! হেসে উঠেছিল ঝুমি তখন।

বাবার যেমন কাণ্ড! ঐ লাল শাড়ী পরবার বয়স তার আর আছে নাকি? কোনদিন শাড়ীটা পরেনি।

আজ বার করেছে। বয়সটা তার হঠাৎ কমে গেল নাকি! আপন মনেই হাসল ঝুমি।

একটু ইতস্ততঃ করে কমলার কাছে শাড়ী-জামাটা নিয়ে গিয়ে বলল—'এই লাল শাড়ীটাই পরে ছিঁড়ে ফেলি মা—এ পরে ত' আর বাইরে বেরুতে পারবনা?'

যেন নিতান্ত নিরুপায় হ'য়েই তাকে পরতে হচ্ছে—এমনি একটা

সুখের ভাব করে ঝুমি, তবুও মুখটা লাল হয়ে ওঠে। মা না টের পান—কার জন্যে তার এই সাজসজ্জা!

কমলা হেসে বলেন—'নাঃ,—বড্ড বুড়ি হয়ে গেছিস তুই—লাল শাড়ী পরবার কি আর বয়স আছে—? বাইরে না পরবি ত' ঘরেই পর—বাক্সে পড়ে কেন পচবে—?'

নিশ্চিন্ত হয়ে ঝুমি চলে যায়।

যাক—মা তার ছলনা ধরতে পারেননি।

দরজার কড়াটা নড়ে উঠল।

ঘরের ভেতর ঝুমি তখন প্রসাধনে ব্যস্ত—মধুর একটি লজ্জা ও আনন্দে তার বুক দুলে উঠল।

কাজল-কালো গভীর দুটি চোখে স্বপ্ন ঘনিয়ে এল।

দরজা খুলে দিয়ে কমলা অবাক হয়ে গেলেন।

অমিতাভ বা সোমদেববাবু কেউই নয়।

এযে তাঁর পক্ষে আশাতীত স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য।

দরজার বাইরে নাকে রুমাল দিয়ে শুভেন্দু দাঁড়িয়ে।

মুহূর্ত্তকাল হতবাক হ'য়ে থাকেন কমলা—তারপর সস্নেহে বলেন—'কে ইন্দু? এস ভাই—এস।'

ঘরে প্রবেশ করেন শুভেন্দু।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখেন কমলা। কোথায় বসাবেন ভাইকে? যত বিপন্ন বোধ করেন—আনন্দিতও হন তেমনিই।

রংচটা সতরঞ্চী পাতা তক্তাপোষটায়ই বসতে বলবেন না সবে ধন নীলমণি হাতলহীন চেয়ারটাতে বসাবেন ভেবে পান না।

এই নীচু একতলা বাড়ী। একটা ফ্যান পর্য্যন্ত নেই—কেমন করে বসবে তাঁর সুখী ভাই?

শুভেন্দুও চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে অবশেষে চেয়ারটা টেনে নিয়েই বসে পড়লেন।

কমলা মেয়েকে ডাকলেন—ও ঝুমি—শিগ্‌গীর পাখাটা নিয়ে আয়। তোর মামা এসেছেন যে!'

ঘরের ভেতরেই ঝুমি তা' জানতে পেরেছিল। অবাক হ'য়ে গিয়েছিল সে।

ডলির বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে এসে যিনি চৌকাট থেকেই নিমন্ত্রণ সেরে চলে গিয়েছিলেন—আজ একেবারে ঘরে ঢুকে বসলেন! ব্যাপার কি—?

পাখাটা হাতে নিয়ে গম্ভীর মুখে সে বেরিয়ে এল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই—শুভেন্দু বললেন—'থাক-থাক।'

ভাল করে একবার দেখে নিলেন বীজনরতা ঝুমিকে।

রূপসী সত্যিই! এ রূপ রাজার ঘরেই মানায়।

মানিক মোহিত হবে সে আর আশ্চর্য্য কি।

দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল শুভেন্দুর। আলোবাতাসহীন একটা কোটর। তাড়াতাড়ি খবরটা জানিয়ে উঠে যেতে পারলে বাঁচা যায়।

কী সঙ্কীর্ণ গলি! গাড়ী আসতে পারে না—বড় রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে হেঁটে আসতে হয়েছে এই নোংরা গলি দিয়ে। আহা! কী করেই যে কমলা এই আবেষ্টনে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন ভাবতেও কষ্ট হয়।

যাক—এইবার মেয়ের বিয়ে দিয়ে আবার অভিজাত সমাজে মিশতে পারবেন।

কিন্তু আর বসে থাকা যায় না।

সোমদেববাবু এখনও ফেরেন নি। তাঁকে না জানিয়ে সব ঠিকঠাক না করে—উঠবেনই বা কি করে ?

সুহাসিনীর উদ্বেগ-ব্যাকুল মুখ মনে করেই এত কষ্ট করেও শুভেন্দু বাবু বসে থাকেন।

কমলাও অস্থির হয়ে পড়েন। বিকেলে এসেছে শুভেন্দু—তাকে ত' জলখাবার দিতে হয়। কতদিন পরে তাঁর ভাই এসেছে—ঘরের সামান্য যা জলখাবার তা ত' আর তার মুখে দেওয়া যায় না—।

অমিতাভকে সে খাবার স্বচ্ছন্দে দেন—কিন্তু শুভেন্দুকে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। সোমদেববাবু এসে পড়লে বাঁচেন কমলা।

দরজার কড়া আবার খট্‌খট্ করে উঠল।

কমলা তাড়াতাড়ি দরজা খুললেন—যাক সোমদেববাবুই এসেছেন। স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে সোমদেববাবুকে কমলা বললেন—'ইন্দু এসেছে—এই কিছুক্ষণ হ'ল।'

বিস্মিত হয়ে সোমদেববাবু বললেন—'ও তাই নাকি!'

চুপি চুপি বললেন—'আচ্ছা, আমি তাহ'লে খাবারটা কিনে নিয়ে এক্ষুনি আসছি।'

শুভেন্দু বললেন—'জামাইবাবু এখুনি এসেই আবার কোথায় গেলেন দিদি ? আমার কিন্তু বেশী সময় নেই।'

হাসি পায় ঝুমির। অফুরন্ত সময় যাদের—তাদেরই সময়াভাব!

বিব্রত কমলা বললেন—'এক্ষুনি আসছেন। ঝুমি তুই না হয় ইন্দুকে তোর ঘরে নিয়ে যা।'

শুভেন্দু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—'না—না—এই বেশ আছি।'

ঘর্ম্মাক্ত শুভেন্দুকে বাতাস করতে করতে ঝুমি বলল—'ও ঘরটা আরও গরম মা।'

কমলা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

মেয়েটা যেন কি—!

বোঝে সব—কিন্তু এমন বেপরোয়া ভাব!

ওর ঘরটাই একটু সাজানো-গোছানোও বটে তাছাড়া লোকজন নেই—শুভেন্দুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনেই সোমদেববাবু হাতে করে খাবার আনবেন—তাই না তাকে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে বলেছিলেন?

কিন্তু সোমদেববাবুর মত ঝুমিরও দৃকপাত নেই এসব বিষয়ে।

খাবারের ঠোঙ্গা হাতে সোমদেববাবু প্রবেশ করলেন। কমলা তাঁর হাত থেকে খাবারটা নিয়ে জলখাবার সাজিয়ে আনতে চলে গেলেন।

মেয়ের হাত থেকে পাখাটা নিয়ে তক্তাপোষটায় বসে পড়ে সোমদেববাবু নিজেকে পাখা করবার ছলে জোরে জোরে শুভেন্দুকে বাতাস করতে লাগলেন।

মহামান্য অতিথি তাঁর গৃহে—কোন ত্রুটি যেন না হয় আজ তার আতিথ্যের।

সহাস্যে প্রশ্ন করলেন—'কি খবর শুভেন্দু—সব ভাল ত'—?'

'হ্যাঁ—সব এখন ভালই। একটা সম্বন্ধ এনেছি ঝুমির জন্যে—'

ঝুমি নিজের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সোমদেববাবু শুভেন্দুর মুখের দিকে চাইলেন। হঠাৎ এত করুণা!

কমলা জলখাবারের রেকাবী আর জলের গ্লাস এনে টুলে রাখলেন।

শুভেন্দুকে অনুরোধ করলেন—'ইন্দু—একটু জল খাও ভাই—আমি যাই চা করে আনি।'

শুভেন্দু বললেন—'চা এখন আমি খাইনা। তুমিও বোস দিদি—কথা আছে।'

ঝুমি এসে বাপের জলখাবার দিয়ে গেল।

সোমদেববাবু খেতে আরম্ভ করলেন।

কমলা আরেকবার অস্ফুটে অনুরোধ করলেন শুভেন্দুকে। শুভেন্দু সে কথায় কোন সাড়া না দিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে সোমদেববাবুর দিকে চেয়ে বললেন—'হ্যাঁ—এ সম্বন্ধটা ত' খুব ভালই মনে হয় আমার। এক পয়সা আপনাকে খরচ করতে হবেনা। মানিক—মানিককে জানেন নিশ্চয়ই,—আমার সম্বন্ধী? সে ঝুমিকে বিয়ে করতে চায়।'

সোমদেববাবু নিরুত্তরে খাওয়া শেষ করলেন। হাত-মুখ ধুয়ে এসে আবার তিনি পাখার বাতাস করতে লাগলেন শুভেন্দুকে।

কি বললে উত্তরটা রূঢ় শোনাবে না—ভাবতে লাগলেন। কমলা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

ইন্দু কি জানেনা—এ সম্বন্ধ ত' অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। সোমদেববাবু বা কমলা কারুরই এতে মত ছিলনা।

রূপ ও অর্থ যেমন আছে—তেমনি বহু গুণেরও অধিকারী মানিক।

অব্যবস্থ-চিত্ত, অভিভাবকহীন অভিজাত তরুণ।

কলেজের পর কলেজ বদলেছে—অথচ আজ পর্য্যন্ত আই. এ. পাশও করতে পারেনি।

রেসের মাঠে তার নিয়মিত গতিবিধি।

আরও অনেক কিছুই শোনা যায় তার নামে। সব বিশ্বাস না করলেও যেটুকু জানা যায় তাতে তার হাতে মেয়ে দেওয়া যায় না।

শিক্ষা, রুচি কোনটাতেই মিল হবে না ঝুমির সঙ্গে। বড়লোকের আদুরে দুলাল—ঝোঁক চেপেছে—ঝুমিকে বিয়ে করবার। সখ মিটলেই খেলনার মতই ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

ধীর স্বরে সোমদেববাবু বললেন—'তুমি হয়ত জান না শুভেন্দু—এ-সম্বন্ধ আগেও এসেছিল। ভারী দুঃখিত হচ্ছি তোমায় জানাতে—এতে আমাদের মত নেই।'

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন শুভেন্দু।

নিজের শ্রবণশক্তির ওপরই যেন আস্থা হারিয়ে ফেললেন তিনি। ভুল শুনলেন না ত?

সংশয়াকুল চোখে একবার দুজনের মুখের দিকে চাইলেন। কমলা অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন। সোমদেববাবুর মুখে নির্লিপ্ত ভাব।

স্কুল-মাষ্টারী বেশীদিন করলে মানুষ বিশেষ এক শ্রেণীর জীবে পরিণত হয়ে যায় শোনা ছিল বটে—কিন্তু আজ যেন তা প্রত্যক্ষ করলেন।

অপমানে তাঁর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

সোমদেববাবু উঠে পড়লেন।

কাঁধের উপর চাদরটা ফেলে শুভেন্দুকে বললেন—'আচ্ছা আমি যাই শুভেন্দু—আমার একটু কাজ আছে।' সোমদেববাবু চলে যেতেই শুভেন্দুও উঠলেন।

এত অপমানিত তিনি আর কখনও হননি। লজ্জায়, ঘৃণায় মর্মে মর্মে যেন দগ্ধ হচ্ছিলেন। এক মুহূর্তও আর থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল

না—তবু বড় মুখ করে নাকি বলে এসেছেন সুহাসিনীকে তাই আবার বসলেন।

গলাটা ঝেড়ে নিয়ে শুভেন্দু বললেন—'দিদি, তুমি জামাইবাবুকে একবার ভেবে দেখতে বোল—এমন সম্বন্ধ কি আর পাবে? কত বড় জমিদারীর মালিক—তা ত তুমি জানই। তুমি ত তাকে দেখেইছ আমি নিজের মুখে কি আর বলব। মাষ্টারী করলে লোকের স্বাভাবিক জ্ঞান সত্যিই দেখছি লোপ পেয়ে যায়।'

কাষ্ঠহাসি হেসে বোনের মুখের দিকে তাকালেন সমর্থনের আশায়। নতমুখে স্তব্ধ হয়ে কমলা বসে রইলেন। কি করে জানাবেন ভাইকে তাঁরও আপত্তি আছে।

শুভেন্দু তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাইলেন কমলার মুখের দিকে—না কোথাও সমর্থনের ইঙ্গিত নেই সে মুখে। ফাঁসীর আসামীর মত বিবর্ণ মুখে কমলা বসে আছেন। অসহ্য রাগে আর ঘৃণায় সারাদেহে যেন শুভেন্দুর আগুন ধরে গেল।

এত স্পর্দ্ধা এত অহঙ্কার যে একজন গরীব স্কুলমাষ্টারের থাকতে পারে এযে স্বপ্নাতীত বিস্ময়!

তাহলে যে গুজব শুনে এসেছেন তিনি তাঁর ভায়রাভাই মোহিত মোহনের বাড়ীতে—সে সত্যিই।

শ্লেষ-তিক্ত স্বরে তিনি বললেন—'যে আশায় তোমরা এমন সম্বন্ধ ছাড়ছ—তাকি আর আমি জানি না ভেবেছ—! রূপসী মেয়েকে দেখে অমিতাভ মিত্র ভুলতে পারে—কিন্তু তার বাপ সতীশ মিত্রকে শুধু তাতেই ভোলাতে পারবে না।'

চমকে উঠলেন কমলা।

শবের মত বিবর্ণ মুখে ভাইয়ের দিকে চাইলেন। অতর্কিতে কে যেন একটা ছুরি তাঁর বুকে বিঁধিয়ে দিয়েছে। তাঁর মুখ থেকে অস্ফুট আর্ত্তস্বর বার হল – 'ইন্দু!'

শুভেন্দু ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন।

ঝুমি ঘরের মধ্যে উৎকর্ণ হয়ে বসেছিল। শুভেন্দুবাবুর কথায় সেও চমকে উঠল।

ছাইয়ের মতই পাংশু হয়ে গেল তার আনন্দোজ্জ্বল মুখ কিন্তু তখনই আবার সে মুখ রোষে ক্ষোভে ঘৃণায় আগুনের মতই আরক্ত হয়ে উঠল।

রূপ – রূপ—রূপ!

ছোট থেকেই রূপের প্রশস্তিই শুনে এসেছে ঝুমি। আনন্দই পেয়েছে তাতে আজ কিন্তু নিজের রূপের জন্যে সে লজ্জায় ঘৃণায় মরমে মরে গেল।

উঃ—কী কদর্য্য, কী ঘৃণিত কথা—তার দুইকানে যেন কে তপ্ত সিসা গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে।

বাইরের ঘরে বেরিয়ে এল ঝুমি।

কমলা চলে গেছেন। দরজাটা আধ-ভেজানো।

শুভেন্দুবাবুর সাজানো খাবার তেমনিই পড়ে আছে।

আসন্ন ঝড়ের আগের মূহূর্ত্তের প্রস্তুতির মতই স্তব্ধ গম্ভীর হয়ে ঝুমি বসে রইল। প্রতীক্ষা করতে লাগল অমিতাভের। আজকের প্রতীক্ষায় কিন্তু আর ভীরু সলাজ কুমারী-হৃদয়ের আনন্দমধুর উৎকণ্ঠা ছিল না।

নিজের হাতে নিজের হৃদয়কে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হবে তারই নিষ্ঠুর সঙ্কল্প যেন বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠে ফুটে উঠেছে।

অমিতাভ প্রবেশ করল।

বিস্মিত হয়েই এসেছিল অমিত—বাইরের দরজা ত' কোনদিনই খোলা থাকে না।

ঘরে ঢুকেই তার মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

তারই জন্যে প্রতীক্ষা করছে তার মানসী—?

বুকের রক্ত তার উত্তাল হয়ে উঠল।

এগিয়ে এল অমিতাভ।

উঠে দাঁড়াল ঝুমি। দীপ্ত চোখে তার দিকে চেয়ে স্থির গম্ভীর স্বরে সে বলল—'আমরা গরীব—কেন আসেন আমাদের বাড়ী—?'

বিস্মিত অমিতাভ বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চাইল। পল্লবঘন কাজল-কালো স্বপ্নভরা চোখ আজ হীরার মত প্রদীপ্ত। দৃঢ়বদ্ধ পেলব দুটি ওষ্ঠ! স্ফুরিত নাসারন্ধ্র—আগুনের মত রাঙা তার গৌরমুখ। কিন্তু এ ত অনুরাগের রঙ নয় এযে স্পষ্ট ঘৃণা! এযে তীব্র বিতৃষ্ণা—চলে যাবার রূঢ় সঙ্কেত!

কিন্তু না—না—। অমিতাভ ভুল করবেনা।

বঙ্কিম গ্রীবায় কম্পিত অধরে যে অভিমানিনী দাঁড়িয়ে আছে, তার অভিমানকে যেন অমিতাভ অন্য কিছু না ভাবে।

অমিতাভ ঝুমির আরও কাছে এগিয়ে আসে। মৃদু স্বরে বলল—'কেন আমি—তা কি তুমি বুঝতে পার না ঝুমি?'

মুদিত পদ্মের কাছে এমনি করেই কি ভ্রমর গুঞ্জন করে তার ঘুম ভাঙ্গায়?

অসহ্য পুলকে সারা শরীর শিউরে উঠল ঝুমির। কঠোর এ বিদ্রোহ যেন সমর্পনের একটি মধুর সঙ্গীতে এখনি ভেঙ্গে পড়বে।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণেই তার মধ্যে জেগে উঠল আত্ম-সচেতন এক নারী।

অমিতাভর কাছ থেকে সরে গেল ঝুমি।

দীপ্ত চোখে তার দিকে চেয়ে নিষ্প্রাণ স্বরে সে বলল—'আমার নাম শিখা।'

অমিতাভর মুখ একবার আগুনের মতই আরক্ত হয়ে তখনই ছাইয়ের মতই বিবর্ণ হয়ে গেল।

ঘর বাড়ী সব যেন তার চোখের সামনে লেপে মুছে একাকার হয়ে গেল—শুধু তার বেদনাবিহ্বল চোখের সামনে লাল শাড়ীপরা রূপসী দীপ্ত এক বহ্নিশিখার মতই জ্বলতে লাগল।

যাক সব শেষ হয়ে গেল।

যা ছিল ধ্রুবসত্য—মায়া মরীচিকার মতই সে একবার তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে লুব্ধ করে—শূন্যে মিলিয়ে গেল। কে জানত একমুঠো ফুলের মতই কেমন এই মেয়েটির মনে এত বিতৃষ্ণা এত ঘৃণাও তার জন্যে জমে উঠেছে! ভুল—ভুল—বিরাট এক ভুলের ওপর তার আশার সৌধ তুলতে গিয়েছিল অমিত—তাই খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেছে। বিংশ শতাব্দীর সেও এক অভিশপ্ত জীব।

যাকে সে ভালবাসে—তারই কাছে পেয়েছে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা! শিখা—সত্যিই অগ্নিশিখা সে।

মুগ্ধ পতঙ্গ নিজেকে দগ্ধ করেছে শুধু—সেই দীপ্তিময়ী বহ্নিশিখাকে এতটুকু কম্পিতও করতে পারেনি।

অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা নিজের মহিমায় তেমনিই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে—।

অমিতের মত কত হতভাগ্য পতঙ্গ হয়ত সেই রূপবহ্নিতে দগ্ধ হবে —কিন্তু তার দীপের মত প্রদীপ্ত দুই চোখে এতটুকু বাষ্পও ঘনিয়ে আসবে না।

তবু এ দুর্ব্বিষহ বেদনা সে একাই বহন করত যদি! তার আহত পৌরুষের লজ্জা অপমানের একজন সাক্ষী যদি না থাকত।

বিধাতার কি নির্ম্মম পরিহাস!

সেইদিনই সে সমরকে আগে সব জানিয়ে তারপর সোমদেববাবুর বাড়ী গিয়েছিল!

সমর আজ আসবে।

তারই জন্যে প্রতীক্ষা করছে অমিতাভ।

সকলের সঙ্গে দেখা করবার আগেই তাকে বলে দিতে হবে।

বাড়ীতেই আছে অথচ মার কাছে যেতে পারেনি।

তাঁর সেই স্নেহদৃষ্টির সামনে সে কি নিজের এ বেদনা লুকিয়ে রাখতে পারবে—?

প্রথম লুকোচুরির সূত্রপাত হল অমিতাভের জীবনে। বাড়ীতেই আছে অথচ মার কাছে নেই এ যেন ধারণাতীত ব্যাপার সবার কাছে।

তাই একবার বাগানে বেড়িয়ে এসে চুপি চুপি নিজের ঘরে ঢুকে প্রতীক্ষা করছে সমরের।

আশা আকাঙ্ক্ষা বাসনা কামনা সবই যেন শেষ হয়ে গেছে। বিরাট অবসাদ তাকে গ্রাস করেছে। কিন্তু তবু তাকে এ অবসাদ জয় করে উঠে দাঁড়াতেই হবে। সব শেষ হয়—কিন্তু কর্ত্তব্যের শেষ হয় না। কেউ যেন জানতে না পারে তার এই ব্যর্থতার ইতিহাস। মা যেন না জানেন।

করুণের বিয়ের পরই তিনি বড় বিমর্ষ হয়ে গেছেন—একথা শুনলে বড় আঘাত পাবেন তিনি।

আর ত কয়েকটা দিন—একটাদিন সে মুখোস পরেই থাকবে। তারপর কত দূর দেশে চলে যাবে।

দীর্ঘ তুটি বৎসরের ব্যবধানে দিনে দিনে তিলে তিলে কি ভুলে যেতে পারবে না সেই তিলোত্তমাকে?

অমিতাভের তুই চোখ জলে ভরে উঠল।

ছিঃ ছিঃ—। একা ঘরে নিজের তুর্ব্বলতায় লজ্জিত হল অমিতাভ।

ছোট থেকে কেউ তার চোখে জল দেখেনি। পুরুষ মানুষের চোখে জল আসা যেন একটা ক্ষমাহীন অপরাধ—এমনিই অনমনীয় ছিল তার মনের ভাব।

বুকের মধ্যে আগুণ জললেও চোখে তার জল আসবে কেন?

কিন্তু না—না। অমিতাভ ত' তাকে ভুলতে চায় না। সেই পাষাণ প্রতিমার জ্যোতির্ম্ময়ী মূত্তি তার অন্ধকার হৃদয়াকাশে চির জাগরূক থাক এইত তার মনের কামনা। অমিতাভ উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

বাইরে কার পদশব্দ। সমরই আসছে।

চোখের জল অনেক আগেই শুকিয়ে গিয়েছিল—মুখেও জোর করে টেনে আনল শুষ্ক-শীর্ণ একটু হাসি। দরজা খুলে সমরকে আহ্বান করল—'এস সমর।'

বিস্মিত স্বরে সমর বলল—'তুমি বাড়ীতেই আছ তাহলে?'

'হ্যাঁ ভাই—একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

সহাস্যে ঘরে ঢুকল সমর।

বলল—'আবার কি কথা আমার সঙ্গে? তোমার সব কথাই ত আমি শুনেছি। যাতে আর একজনের সঙ্গে অফুরন্ত কথাগুলো তাড়াতাড়ি বলতে পার তারই ব্যবস্থা করতেই ত' আমি আজ এসেছি তোমারি কথামত।—তবে?'

বিস্মিত চোখে চাইল সমর অমিতাভের মুখের দিকে। তার ঠোঁটের কোণে কৌতুকের সূক্ষ্ম একটু হাসি।

নতমুখে অমিতাভ বলল—'সেই জন্যেই তোমায় ডাকলুম সমর। কোন ব্যবস্থা আর করতে হবে না। কাউকেই বলতে হবে না।'

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তার দিকে চাইল সমর।

অমিতাভের চোখের কোলে কালি—। যেন কতদিন রোগ ভোগ করে উঠেছে এমনিই তার মুখে শ্রান্তির ছাপ।

কালকের সেই আনন্দ উৎসাহে উদ্দীপ্ত তরুণের এক রাত্রেই একি পরিবর্ত্তন?

অমিতাভের হাত নিজের হাতে তুলে ধরে সহানুভূতিমাখা স্বরে সমর বলল—'কি হয়েছে অমিত? আমায় সব খুলে বল। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।'

অতিকষ্টে অমিতাভ তার চোখের জল সামলাল।

অন্যদিকে চেয়ে অকম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে বলে গেল তার পরাজয়ের লজ্জাকর কাহিনী।

কিন্তু যতই নিস্পৃহ স্বরে বলুক—ললাট থেকে আকর্ণ তার রাঙা হয়ে উঠল। মুখে ছড়িয়ে পড়ল দুঃসহ বেদনার ছায়া।

সমর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তাকুল মুখে ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচনা করতে লাগল।

সিগারেটটা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে সে মুখ খুলল।—'যতদূর বুঝলুম —মেয়েটি অসম্ভব খেয়ালী। আর তোমাকেও বলিহারী—এত সহজেই তুমি হাল ছেড়ে দিলে ?'

ম্লান হেসে অমিতাভ বলল—'তুমি হলে কি করতে ?'

'আমি হলে বেমালুম একথা চেপে যেতুম। সোজা গিয়ে তার বাপের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতুম।

'আশা করি তাঁরা তাতে রাজী হতেন। তোমারও তাই করা উচিত।'

এত দুঃখের মধ্যেও সমরের কথা শুনলে হাসি পায় অমিতের। দুঃখ হতাশা যেন তার কাছ ঘেঁসতেও ভয় পায়।

তার সংস্পর্শে এলেও যেন বেদনা অনেক হালকা হয়ে আসে। অমিত বলল—'না, তাঁদের হয়ত অমত হ'তনা—বিয়ে নিশ্চয়ই হ'ত আমি ধরে নিচ্ছি। কিন্তু সেই বিমুখমনা রূপসীকে জোর করে আয়ত্ত করে আমার কি লাভ হ'ত বলতে পার ?'

সজোরে টেবিলে এক মুষ্টাঘাত করে উত্তেজিত হয়ে সমর বলল—'বিমুখমনা—মেয়েদের মনের সম্বন্ধে তুমি কি জান শুনি—? দেবতারাও যে মনের তল খুঁজে পাননা, তুমি পনের কুড়ি দিনের পরিচয়েই তার মনের অন্ধি-সন্ধি সব জানতে পেরেছ নাকি—? হুঁ !'

গভীর অবজ্ঞাভরে সে অমিতাভের দিকে চাইল।

সকৌতুকে অমিতাভ সমরের দিকে চাইল।

অদ্ভুত ক্ষমতা আছে সমরের।

এরই মধ্যে অমিতাভের অন্ধকার হৃদয়ে আশার বিদ্যুতের চকিত আলোক দেখা যাচ্ছে।

সোৎসাহে সমর বলল—'জান স্বয়ং কবি-সম্রাট কি বলে গেছেন?—

রমনীরমণ

সহস্রবর্ষের সখা—

সাধনার ধন।

সহস্র বৎসরের সাধনায় যাদের মন জানতে হয়—তার মন তুমি একটি অসংলগ্ন কথাতেই বুঝতে পারবে—এতই পণ্ডিত—?'

সমরের উৎসাহে উজ্জ্বল মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়েছিল অমিতাভ।

চোখেমুখে তার একটু দুষ্টু হাসি খেলে গেল।

গম্ভীর স্বরে সে বলল—'সাবধান সমর! আমার মনে হচ্ছে—তুমি তার প্রেমে পড়ে যাচ্ছ!'

টেবিল বাজিয়ে সমর সোৎসাহে গান ধরল—

'এখনও তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি—

সখা হে—অমনি নিজের মাথা নিজে খেয়ে বসেছি।'

হো হো করে হেসে উঠল অমিতাভ।

মল্লিকা যাচ্ছিল সেইদিক দিয়ে। সহাস্যে তাকে ডাকল—'মল্লি, শুনে যা—সমর কি সুন্দর গান গাইছে। প্রথম লাইনটা ত জানি—দ্বিতীয় লাইনটা কার রচনা সমর—?'

সগর্ব্বে বুকে হাত ঠেকিয়ে সমর বলল—'এই শর্ম্মার।' মল্লিকা ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার সমরের মুখের দিকে চেয়ে সে চলে গেল।

কিছু বিশ্বাস নেই তাকে। মুখের ত' আর কোন আটঘাট নেই, হয়ত কোন বেফাঁস কথা বলেছে তারই সম্বন্ধে দাদাকে।

সমর সহাস্যে বলল—'তুমি এবার চুপচাপ থাক অমিত। আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

'না—সমর না।' ব্যগ্র ব্যাকুলকণ্ঠে অমিত বলল—'এ সম্বন্ধে আর কোন কথা নয়। আমার অনুরোধ—একথা তুমি আর কাউকে বোলনা।'

অমিতাভের মুখের হাসি কখন মিলিয়ে গেছে।

তার বেদনার পাণ্ডুর আশাহত মুখের দিকে চেয়ে সমর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

এইত ভাল—এইত ভাল হয়েছে।

অবুঝ মনকে বার বার প্রবোধ দেবার চেষ্টা করল ঝুমি।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে এ যেন লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখা। এ যেন বামন হয়ে চাঁদ ধরবার স্পর্দ্ধা!

গরীব স্কুলমাষ্টারের মেয়ের এ আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন কেন? সতীশ মিত্র, তিনি কি খুব বড়লোক—?

নিশ্চয়ই তাই—নাহলে শুভেন্দু তাঁর নাম জানলেন কেমন করে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য বড়লোকদের একবার দেখলেই যে সে চিনতে পারে বলে মনে করত তার সে অভিজ্ঞতা কি একেবারেই ভুল—?

ছদ্মবেশী রাজপুত্র!

কই ঝুমি ত একদিনের জন্যেও সন্দেহ করেনি অমিতাভ বড়লোকের দুলাল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এই সঙ্কীর্ণ গলির ভেতর আধ-অন্ধকার ঘরে কাটিয়ে গেছে, তার মুখে এতটুকু অস্বস্তির ছায়াও পড়েনি।

যে বাড়ীতে ঢুকলেই শুভেন্দুবাবু ক্ষণে ক্ষণে নাকে সুগন্ধী রুমাল চাপা দেন, অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্ করতে থাকেন, কতক্ষণে উঠবেন বলে—জলখাবার সাজিয়ে দিলে ঘৃণায় স্পর্শমাত্র করেন না—সেইখানেই আরেক-জন অভিজাত তরুণের একি অদ্ভুত আচরণ ?

সেত তার অভিনয় নয়। দিনের পর দিন কি মানুষ অমন নিখুঁত ভাবে অভিনয় করে যেতে পারে—?

বার বার মনে পড়ে যায় তার সেই সুন্দর মুখ !

কেমন করে সে এখানে দিনের পর দিন কাটিয়েছে—কেন এসেছে বারবার—?

'কেন আসি—তাকি তুমি বুঝতে পার না ঝুমি—?'

ঝুমির মনের মধ্যে বাঁশীর মত মধুর সুরে কথাগুলি বেজে উঠল।

আশায় উজ্জ্বল তরুণের দীপ্ত মুখ মনে পড়ে যায়—আবার তখনই কেমন করে সেই মুখ বেদনায় নীল হয়ে গিয়েছিল তাও মনে পড়ে ! শিখা নাম তার এতদিনে সত্যিই সার্থক হয়েছে।

কেমন করে অমিতের মুখ আগুনের মত রাঙা হয়ে উঠেই ছাইয়ের মতই পাংশু হয়ে গেল তার কথায়।

কিন্তু যে বেদনা তাকে সে দিয়েছে—সে ব্যথা যে শতগুণ হয়ে ফিরে এসে তারই বুকে বিষাক্ত তীক্ষ্ণ তীরের মতই বিঁধে আছে একথা কি অমিতাভ কোন দিন জানতে পারবে ?

মুখের কাছে সুধার পাত্র এগিয়ে এসেছিল—সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারই সামনে সেই পাত্র খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেছে !

ভেঙ্গে গেছে তার মন—তার আশা-আকাঙ্খা—তার ভবিষ্যৎ!

বড়লোকদের মন এত বড় হয়—এত সহজ হতে পারে তারা গরীবের বাড়ী এসে—?

বিনিদ্র রাত্রি কেটে যায় ঝুমির।

একটি আশাহত বেদনার্ত্ত তার রাত্রির নিদ্রা তার দিনের শান্তি হরণ করে।

একটি কথাই তার মনের মধ্যে গুঞ্জন করে তাকে ক্ষণেক্ষণে উতলা করে। ঘুম আসে অনেক রাত্রে—তাও সেই একজনেরই এলোমেলো স্বপ্নে ভরা।

ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে বিস্মিত হয়—তার চোখের জলে বালিশ ভিজে উঠেছে।

দিনের ঝুমির সঙ্গে রাত্রের ঝুমির কোন মিল নেই।

দিনের বেলা নিজের আচরণে সে লজ্জিত হয়—মনকে দৃঢ় করে। বারবার মনে মনে বলে—এই ভাল হয়েছে।

তার গরীব বাপকে অপমান কি সে মেয়ে হয়ে করতে পারে—? তাদের কাঞ্চন নেই—তাই কৌলিন্যও নেই। বাপের অর্থ নেই—তাই বংশ-মর্য্যাদাও নেই।

ধনী সতীশ মিত্র হয়ত ছেলের এ খেয়াল উপহাসের অট্টহাসিতে উড়িয়ে দিতেন! তারপর হয়ত তাঁর কাছ থেকে সোমদেববাবুর কাছে খুব অপমানজনক তীক্ষ্ণ পত্র আসত।

কি লিখতেন তিনি—? তিনিও হয়ত লিখতেন—মেয়ের রূপ দেখিয়ে তাঁরা ছেলেকে ভোলাবার চেষ্টা করেছেন!

শবের মতই পাণ্ডুর মুখে বসে থাকে ঝুমি।

তারপর? ছেলের এই পাগলামী সারাবার জন্যে ধনীর এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে বধূ করে ঘরে আনতেন।

তারচেয়ে সে নিজেই এই লোভনীয় নাটিকার ওপর যবনিকা ফেলে দিতে পেরেছে এই ভাল।

বুক ভেঙ্গে যাক—সে নিজে ত ভাঙ্গে নি।

মা-বাবার মাথা ত' তার জন্যে ধূলোয় লুটিয়ে পড়েনি।

অমিতাভ? যতই হোক—সেও ত বড়লোকেরই ছেলে। হয়ত কিছু দিন কষ্ট হবে—কিন্তু ভুলে যাবে সে—নিশ্চয়ই ভুলে যাবে। সুখী হবে আবার।

একথা মনে ভাবতেও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ঝুমির—তবু সে জানে এই ধ্রুব সত্য।

কে জানে কখন সে বক্ষের মণি ফেলে দিয়েছে, কি দিয়েছে সে ত রাজার দুলাল জানল না—ধুলায়ই সে ঢাকা পড়ে রইল।

কিন্তু শুধু দিয়েই আনন্দ হয় না কেন? কেন সে ভুলে গেছে—ভুলে যাবে মনে করলেও বুক ভেঙ্গে যায়?

নিজের ঘরে এসে কমলা অভিভূতের মতই বসে রইলেন। সারা দেহে একটা ঘৃণার ঝড় বয়ে গেল।

দুর্বিষহ একটা গ্লানিতে তাঁর অন্তরাত্মা দগ্ধ হতে লাগল। ছি ছি—ছি—এমন কথাও শুনতে হল তাঁকে!

তাও কিনা তাঁর পরম স্নেহভাজন ভাইয়ের মুখ থেকেই এই বিষ উদ্গীরন হ'ল!

আজ প্রথম—হ্যাঁ আজই প্রথম তাঁর মনে হ'ল—শুভেন্দু ত' তাঁর সহোদর ভাই নয়—তাই এই মর্ম্মঘাতী শেল হানতে তার দ্বিধা হল না।

তার মুখে আজ যেন বিমাতা দয়াময়ীর ছায়াই দেখতে পেলেন। তেমনিই আত্মম্ভরী স্বার্থ-সর্ব্বস্ব মুখ! নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে যে মুখ ঘৃণায় বিদ্বেষে ক্রুর ভয়াল হ'য়ে উঠে!

বিমূঢ় ভাবটা কাটতে তাঁর মনে হল ঝুমি শুনতে পায়নি ত! বুকের মধ্যে তীব্র একটা যন্ত্রণা বোধ করলেন কমলা।

শঙ্কিত হলেন মেয়ের জন্যে। যদি শুনতে পেয়ে থাকে, তাহলে তার ফুলের মত কোমল মনে এ আঘাত যে বড় লাগবে।

মেয়ের কাছেও মুখ দেখাতে যেন তাঁর লজ্জা করতে লাগল।

যে এমন ঘৃণিত আক্রমণ করেছে সে যে তারই ভাই। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সদর দরজা বন্ধ না করেই তিনি চলে এসেছেন।

অমিতাভ হয় ত এখনও সেখানেই বসে আছে।

কিন্তু সে ত সোজা ঘরের ভেতরই চলে আসে—তবে বোধ হয় আসেনি।

মেয়েটাই বা কি করছে দেখে আসা দরকার একবার। মন থেকে সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে কমলা উঠে পড়লেন। অতি ধীরে ধীরে বাইরের ঘরে এলেন। পায়ে যেন তাঁর কে বিশ মণ শেকল পরিয়ে দিয়েছে।

না,—বাইরের ঘরের দরজা বন্ধই ত।

ঝুমিই বন্ধ করেছে তাহলে। সেই ঘরের সংলগ্ন ঝুমির ঘর—নেহাৎ অন্যমনস্ক না থাকলে সব কথা শুনতে পাওয়াই ত তার পক্ষে সম্ভব।

কি জানি এ আঘাতে সে কি করছে!

বিছানায় পড়ে কাঁদছে নাকি?

কমলা তার দরজার কাছে শঙ্কিত হয়ে দাঁড়ালেন। পরদা দেওয়া দরজা—তবু একপাশ থেকে দেখা গেল—পড়ার টেবিলে বইয়ের মধ্যে তন্ময় হয়ে ডুবে আছে ঝুমি। এত তন্ময় যে কমলা এসে যে দাঁড়িয়ে আছেন তাও টের পেল না।

সেখান থেকে সন্তর্পণে চলে এলেন কমলা। এতক্ষণে তাঁর ফ্যাকাশে মুখে রক্ত ফিরে এল। একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যাক—ঝুমি শুনতে পায়নি।

চাদরটা কাঁধে ফেলে সোমদেববাবু বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় এসে তাঁর মনে হল—কোথায় যাবেন? ছেলে পড়াতে যাবার অনেক দেরী ছিল।

বিকালে মেয়ে ও স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করেই তিনি অবসর বিনোদন করেন। এই তাঁর দরিদ্র জীবনের একমাত্র বিলাস এবং বিশ্রামও।

অমিতাভ এসে যোগ দেওয়ায় বৈকালিক বিশ্রামটা আরও উপ-ভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

আজ কিন্তু আর একজনের উপস্থিতি তাঁকে বিব্রত করে তুলেছিল। একমাত্র শ্যালক তাঁর।

কত মধুর সম্বন্ধ নাকি!

তিনি কিন্তু অহঙ্কারের রজতগিরির দিকে চেয়ে মধুর লেশমাত্রও খুঁজে পান না।

আশ্চর্য্য! দুই ভাই বোনের প্রকৃতিতে বিন্দুমাত্রও মিল নেই।

ভাগ্যিস মিল নেই। ঐ অভ্রভেদী অহঙ্কারকে নিয়ে আর যাই চলুক—গরীব স্কুল-মাষ্টারের ঘর করা চলত না। মনে পড়ে বিয়ের সম্বন্ধ হবার পরে কতবার তিনি ইতস্ততঃ করেছেন।

মহাদেববাবুকেও তাঁর আশঙ্কা জানাতে দ্বিধা বোধ করেননি। বলেছিলেন—'এ কিন্তু ভাল হচ্ছে না বাবা।'

তাঁর আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে সস্নেহ হেসে মহাদেববাবু বলেছিলেন—'খুবই ভাল হচ্ছে—তুই বুঝতে পারছিস না। এ মেয়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—। তাছাড়া—এ যে আমার মা। এখানে তাকে আসতেই হবে।'

সোমদেববাবু আর আপত্তি করেননি—কিন্তু আশঙ্কা তাঁর ছিলই।

কিন্তু সে ভীতি তাঁর মিলিয়ে গিয়েছিল সম্ভ্রমভরা প্রীতিতে। মাধুর্য্যময়ী কমলা। কমলের সৌরভের মতই তাঁর মৃদু নম্র স্বভাব। তাকে লাভ করে তিনি ধন্য হয়েছেন—পূর্ণ হয়েছেন।

গঙ্গার ধার দিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন সোমদেববাবু। কে জানে শুভেন্দু এখন বসে আছেন কিনা!

কে জানে আবার বোনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন কিনা মানিকের মত সুপাত্র তাঁদের ছাড়া উচিত হচ্ছে না। মানিকের সঙ্গে বিয়ে?

বড়লোকের আদুরে খামখেয়ালী নাড়ুগোপাল আয়েসী পুতুলের হাতে তুলে দেবেন তাঁর সোনার প্রতিমা মেয়েকে? অদ্ভুত হাসলেন সোমদেববাবু।

তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল উৎসাহে উজ্জ্বল একটি সুকুমার তরুণ প্রতিভাদীপ্ত মুখ।

হ্যাঁ সেই—একমাত্র যোগ্য পাত্র তাঁর কন্যার। সেই শুধু বুঝবে তার মর্য্যাদা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সোমদেববাবু। সেকালে হলে ঝুমির জন্যে স্বয়ম্বর সভা বসত। সে নিজেই বরমাল্য দুলিয়ে

দিত যোগ্য পাত্রের কণ্ঠে। তাঁর দায়িত্ব কমত। কিন্তু মনে হয় সে স্বয়ম্বরাই হচ্ছে।

যার কথা একটু আগেই ভাবছিলেন তিনি—সেই হয়ত তার কুমারী হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধার কুসুমে গাঁথা মালাখানি গলায় পরেছে। না—আর দেরী নয়।

মেয়ের বিয়ের জন্যে অনেক অনুযোগ শুনেছেন তিনি। রূপসী কন্যাকে নাকি বেশীদিন অনূঢ়া রাখা উচিত নয়। অদ্ভুত সব যুক্তি!

যাবেন নাকি একবার—অমিতাভের বাবা সতীশ মিত্রের কাছে? বড়লোকের সম্বন্ধে ভয় কিন্তু তার যেতে চায় না। যাই হোক—যেতে একবার হবেই।

সম্ভবত রাজী হবেন। যদি না হন—তাহলে?

তাহলে? না থাক সে কথা পরে ভাবলেই চলবে।

খবরের কাগজ দেখে দরখাস্তর পর দরখাস্ত করে চলে নীরা—চাকরীর জন্যে—। আর বিকাশের শত নিষেধ সত্ত্বেও কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যায় নিয়মিত।—'বিকাশ চলে এস। কোথায় আছ জানাও।'

পয়সার অভাবে সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যকুলতায় উদ্বেগে স্নেহের উত্তাপে উদ্বেল সেই শব্দগুলি।

যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়—নিয়মিত কেনে সেই কাগজ। তন্ন তন্ন করে খোঁজে, কিন্তু কোথায় কি!

কলকাতায় আর কোন আকর্ষণ নেই।

আকর্ষণ নেই—? না—ভুল একথা। বরং বেশী আকর্ষণ আছে তাই এখান সে ছাড়তে চায়।

তার লোভী মন শুধু ধ্যান করে তৃপ্তি পায় না—বড় দেখতে ইচ্ছে করে সেই নিঠুর দরদীর সুকুমার তরুণ মুখখানি।

অবশ্য বাড়ী তাকে ছাড়তে হতই। কিন্তু কলকাতা ছাড়বার—চাকরী ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঝাঁপ দেবার কোনই দরকার হ'ত না।

মেয়েদের কোন হোষ্টেলে চলে যেত সে। কিন্তু নিজের মনের ওপর তার তিল মাত্রও বিশ্বাস নেই।

বাড়ী তাকে ছাড়তে হবেই—ছোট্ট বিকাশেরও যে এত ক্ষমতা ছিল—নীরার জানা ছিল না। অনেকটাই যেন সে অভিভাবকের কাজ করেছিল।

তখন—যখন তখন পাশের ফ্ল্যাটের অমূল্যবাবু আকর্ণ হেসে তার ঘরে ঢুকতে সাহস করতেন না।

অযাচিত সহানুভূতি আর অসীম অনুগ্রহ দেখিয়ে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছেন—এই পিতার বয়সী ভদ্রলোক। স্ত্রীর তীক্ষ্ণ বাক্য-বাণও তাঁকে মোহ-মুক্ত করতে পারছে না! তাঁর জন্যে আজকাল নীরার বাড়ী ফিরতেই ভয় করে। ফিরে গিয়েই সে নিজের ঘরে খিল দিয়ে দেয়।

মাসীমার মেয়ে মিনু এসে কড়া নাড়লে তবে এসে খোলে। কিন্তু এরকম করে ত আর বরাবর বাস করা যায় না! তবু ভদ্রলোকের অসীম উৎসাহ।

সিঁড়িতে দেখা হলেও তিনি রাস্তা আটকে গল্প করেন।

গল্প করুন ক্ষতি নেই—কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি নীরাকে সন্ত্রস্ত ভীত ও পীড়িত করে তোলে। অভিভাবকহীনা স্বাধীনা তরুণী—তাঁর চোখে পরম বিস্ময়ের বস্তু।

কি ভাবেন তিনি নীরার সম্বন্ধে কে জানে! তাঁর দৃষ্টি কিন্তু মোটেই ভদ্রোচিত নয়।

অবশেষে উত্তর আসে নীরার দরখাস্তের।

ছোট্ট একটি মনোরম সহরের—এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট্‌ হেড্‌মিসট্রেসের পদ পেয়েছে সে। কোয়ার্টার ফ্রি—সমস্ত টিচারই সেখানে থাকেন। মাইনেটাও আশাপ্রদ। ভবিষ্যত আছে।

মুক্তির একটা নিশ্বাস ফেলল নীরা।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার দু-চোখ ছাপিয়ে জল পড়ল। বুকের ভেতরটা যেন শূন্য হয়ে গেছে তার।

'স্বর্গ হইতে বিদায়—' স্বর্গ থেকে বিদায় ত সে অনেক আগেই নিয়েছে।

করুণের হৃদয় থেকে যেদিন সে নির্ব্বাসিত হয়েছে সেদিনই ত তার সুখ-স্বর্গ মরীচিকার মতই শূন্যে মিলিয়ে গেছে—তবে এ বেদনা কেন—? একা ঘরে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে নীরা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

মহানগরী কলকাতা—এযে তার বাসনার স্বর্গ—তার কামনার স্বর্গ —প্রিয়তমের শত স্মৃতিবিজড়িত প্রীতি ও বেদনার স্বর্গ!

গোছগাছ করতে লাগল নীরা। বিকাশের বাক্সটা মাসীমার ঘরেই রেখে যাবে। তার মধ্যেই মা'র দু-একখানা কাপড় চোপড় আছে। অতি সামান্যই জিনিষ—কিন্তু বড় অসামান্য নীরার কাছে।

ওপরে এবার জানিয়ে দিতে হবে মাসীমাকে।

পনের দিন আগে না জানালে তিনি বিরক্ত হবেন। স্কুল থেকে ফিরেই মুখ-হাত ধুয়ে নীরা চারতলায় গেল—মাসীমা সন্তোষিনীর কাছে।

রান্নাঘরে তিনি তখন রাঁধছিলেন। নীরা গিয়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে সেখানে দাঁড়াল।

'মাসীমা!'

চমকে চাইলেন সন্তোষিনী। স্বস্নেহে আহ্বান করলেন তাকে—'কে মা—নীরা—? এস মা—এস।'

আগে কত সময় মেয়েটার ওপর বিরক্ত হয়েছেন—আজকাল কিন্তু ভারী মায়া হয় তাঁর এই অভাগা মেয়েটার দিকে চেয়ে।

নীরা তার চাকরীর কথা জানাল। বাড়ী সে ছেড়ে দিচ্ছে। নতুন ভাড়াটে বেশী ভাড়ায় বসাতে পারবেন, আনন্দিত হবারই ত কথা—কিন্তু কেমন একটা ব্যথায় তাঁর বুক ভ'রে উঠল।

অভিভূতের মত তিনি চাইলেন নীরার দিকে।

নতমুখে বসে রইল নীরা।

বহুপরে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কুণ্ঠিত ভীরু স্বরে সে বলল—'কত দোষ করেছি মাসীমা—কিছু মনে করবেন না। আর এই ঠিকানাটা রেখে দিন, কোনদিন যদি—' গলাটা ধরে এল নীরার।

সন্তোষিনীর বুকের ভেতর মাতৃহৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। স্বস্নেহে তার চিবুকে হাত দিয়ে চুম্বন করে তিনি বললেন—'ষাট্! কোন দোষ করনি মা—দোষ করবার মেয়ে কি তুমি—? মাসে মাসে মাসীকে চিঠি দিও মা।'

'দেব বইকি মাসীমা।' গলাটা ঝেড়ে নীরা বলল—'যদি কোনদিন বিকাশের ঠিকানা পান—আমায় জানাবেন। তাই ওখানকার ঠিকান আমার দিয়ে যাচ্ছি।'

চমকে উঠে সন্তোষিনী বললেন—'দেখেছ মা, বললে বলে তাই মনে পড়ল। আজ দুপুরে একটা চিঠি এসেছে যে তোমার নামে। দেখ দেখি কার চিঠি?'

চিঠিটা আনতে উঠে গেলেন তিনি।

উদ্বেলিত হৃদয়ে নীরা বসে রইল।

কার—কার চিঠি—? করুণ না বিকাশ? কে লিখেছে নীরাকে চিঠি? সন্তোষিনীর হাত থেকে কম্পিত করে তুলে নিল নীরা চিঠিটা। ব্যগ্র হয়ে ঠিকানাটা দেখেই তার মুখ আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বিহ্বল নেত্রে সে চিঠিটার দিকে চেয়ে বসে রইল। বিকাশ—বিকাশ লিখেছে তাকে চিঠি? বেঁচে আছে তাহলে সে?

চিঠিটা পড়তে পড়তেই নীরার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সন্তোষিনী অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে ছিলেন—ব্যাকুল হয়ে বললেন—'ওমা, ও নীরা অমন করে কাঁদছ কেন মা—? কার চিঠি ওটা?'

দুহাতে চোখের জল মুছে—জলভরা হাসিমুখে কম্পিত স্বরে নীরা বলল—'বিকাশের চিঠি মাসীমা। টাটায় এপ্রেন্টিসের কাজ করছে সে। সেইখান থেকেই লিখেছে।'

সন্তোষিনী খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

সত্যিই অকৃত্রিম আনন্দিত হয়েছেন তিনি।

ছোট থেকেই দেখছেন এদের। মমতা যে তাঁর এতটা পড়ে গেছে এদের ওপর—এর আগে যেন তিনি নিজেও জানতেন না।

তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাস শুনতে লাগল নীরা। 'ওমা দেখেছ—ধন্যি ছেলে যাহোক! কী দস্যি ছেলে মা—এই বাজারে ঐ একফোঁটা ছেলে নিজেই কাজ জোগাড় করে নিল!'

নীরা তাঁর এ ভুল আর ভাঙ্গল না।

নিজে কাজ যোগাড় করে নেয়নি বিকাশ।

করুণের সুপারিশেই নাকি টাটায় ঢুকতে পেরেছে। টাটার জেনারেল ম্যানেজার বুঝি করুণের শ্বশুরের বন্ধু।

বিকাশের খোঁজ পেয়ে তার একটা গতি হয়েছে শুনে সুখী হয় নিশ্চিন্ত হয় নীরা—তবু বড় একটা জ্বালাও অনুভব করে।

কৃপার ভিখারী তারা!

হায় মুগ্ধ কুমারী-হৃদয়। করুণের করুণাকে আজও কি ভালবাসা বলে ভুল কর?

সুহাসিনীর মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির কাঁটা সব সময় যেন বিঁধে আছে।

একি পাগলামী মানিকের!

বিশ্বে কি আর সুন্দরী মেয়ে খুঁজে পেলনা?

অনেকদিন আগের দাম্ভিকা কমলার কথাগুলো তিনি আজও ভুলতে পারেননি।

অদ্ভুত স্পর্দ্ধা কিন্তু!

যাদের কাণাকড়ির যোগ্যতা নেই—তাদেরও এত অহঙ্কার থাকে? আজ ত শুভেন্দু গেছেন সেখানে।

কে জানে ওরা রাজী হবে কিনা!

হবে না আবার! বিদ্রূপের হাসিতে সুহাসিনীর মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

কথায় বলে সেধো ভাত খাবি—? না হাত ধোব কোথায়? রাজী আবার হবেনা!

রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে এলেন। ভাল প্রোগ্রাম ছিল আজ। কিন্তু শুনতে ইচ্ছে হল না।

নরম সোফায় বসে নামজাদা একজন লেখকের আনকোরা নতুন নভেল হাতে নিয়েও কিছুতেই তাতে মন দিতে পারলেন না।

এখনও শুভেন্দু আসছেন না কেন—? গেছেন ত বহুক্ষণ। বোধ হয় সব ঠিকঠাক করছেন। আলোচনায় জমে উঠেছেন বোনের সঙ্গে।

বিরসমুখে সুহাসিনী বসে রইলেন।

দরজার ভারী পর্দ্দাটা সরিয়ে সহাস্যে মধুমতী ও মানিক প্রবেশ করলেন।

ভাইবোনের হাসিমুখের দিকে বিবর্ণ মুখে চাইলেন সুহাসিনী।

শুভেন্দু কি তবে ফিরেছেন নাকি সব ঠিক করে?

তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যেও কণ্ঠে তাঁর স্বর ফুটলো। মধুমতী বললেন—'কি হলো রে তোর সুহাস—? অসুখ করেনি ত—?'

মাথা নেড়ে সুহাসিনী জানালেন—না। তারপর মুখে হাসি এনে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—'সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেল—?'

মধুমতী সহাস্যে বললেন—'হ্যাঁ ভাই,—কালই মানিকের আশীর্ব্বাদ। তা' তুই জানলি কি করে? হঠাৎ ঠিক হল।—আমার—'

বাধা দিয়ে সুহাসিনী বললেন—'আমি জানব না মানে? আমিই ত আগে জানি—। তা উনি সব ঠিক করে এসে বাড়ী ঢোকেননি কেন? বাইরের ঘরেই আছেন বুঝি?'

বিস্ফারিত নেত্রে বোনের মুখের দিকে চেয়ে গালে হাত দিয়ে

বিস্মিত কণ্ঠে মধুমতী বললেন—'অবাক করলি সুহাস—! কি বকছিস আবোল-তাবোল?'

মানিক তাড়াতাড় তাকে থামিয়ে দিল।

সলজ্জ মুখে সুহাসিনীকে বলল—'না ছোড়দি—ভেবে দেখলুম তোমার কথাই ঠিক। ওখানে বিয়ে করলে কিছুতেই খাপ খেত না—তাই—'

বিস্মিত সুহাসিনী স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন—'ওমা তাই নাকি? তা' কোথায় ঠিক হল সেজদি?'

'সেই কথাই ত বলতে এলুম তোকে।' হাসিমুখে মধুমতী বললেন—'আমার খুড়শ্বশুরের মেয়ে আইরিণকে জানিস ত? লরেটোয় পড়া মেয়ে সব বিষয়েই চৌকস। তাকেই—' বোনের গা টিপে হেসে গড়িয়ে পড়লেন মধুমতী।

হাসতে লাগলেন সুহাসিনীও। এতক্ষণে যেন তাঁর মনের মেঘ সম্পূর্ণ কেটে গেল।

মানিক ব্যস্ত হয়ে বলল—'যাই জামাইবাবুকে জানিয়ে আসি। কাল খুব সকালেই সবাইকে নিয়ে ওখানে যেও তোমরা।'

গাড়ী থেকে নেমেই সামনে মানিকের মোটরের দিকে ভ্রূ কুচকে চাইলেন শুভেন্দু। বিপন্ন বোধ করলেন নিজেকে। নাঃ—ছোকরা বিরক্ত করে মারলে দেখছি!

বাইরের ঘরেই নিজের আরাম কেদারায় গা ঢেলে দিয়ে ললাটে হাত বুলতে বুলতে শুভেন্দু ভাবতে লাগলেন—কি বলবেন!

অপমানের জ্বালায় তখনও তাঁর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে। নীচ সংসর্গে তার দিদিরও কি হীন মনোবৃত্তিই না হয়ে গেছে!

শুভ অশুভ বোঝবার স্বদ্ধ্ ক্ষমতা নেই। না হলে—ফ্যানের স্পীড আরও বাড়িয়ে দিয়ে শুভেন্দু আরক্ত মুখে এসে বসলেন।

মানিক প্রবেশ করল।

মানিক নিঃশব্দেই এসেছিল—কিন্তু তার আসার আগেই তার আগমন-বার্ত্তা জানতে পারেন শুভেন্দু।

কস্তুরী মৃগের মত মানিক আসার আগেই ভেসে আসে তার দেহের সৌরভ।

নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করে নিলেন শুভেন্দু।

সলজ্জ হাসিমুখে মানিক এসে দাঁড়াল।

কোন ভুমিকা না করেই সে বলল—'জামাইবাবু,—কাল আমার আশীর্ব্বাদ। আপনারা সকাল বেলাই ওখানে যাবেন। বিকেল ৫ টায় আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন ওঁরা।'

শুভেন্দু হতবুদ্ধির মতই তার মুখের দিকে চাইলেন। তবে কি মানিক পরে গিয়ে সব ঠিক ঠাক করে এসেছে নাকি? অনেক জায়গা ঘুরে তিনি বাড়ী ফিরেছেন। তবু—এত শীঘ্রই সোমদেববাবুর মত বদলে গেল? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন।

বিয়ে বিয়ে করে ছোকরা ক্ষেপে গেল নাকি!

সপ্রতিভ মানিক ও তাঁর দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

রুমালে বার দুই মুখ মুছে ঢোক গিলে সে বলল,—'সেজদি এসেছেন—তাঁর কাছে সবই জানতে পারবেন। ওখানে নয়। আপনি কি সোমদেববাবুর কাছে আজ গিয়েছিলেন নাকি?'

ক্রোধে মুখ আরক্ত হয়ে উঠল শুভেন্দুর।

এই অপদার্থটার জন্যই আজ তাঁকে অপমানিত হতে হয়েছে।

তবু সোয়াস্তিও বোধ করলেন। অতিকষ্টে রাগ সামলে তিনি বললেন—'গিয়েছিলুম, তবে দেখা হয়নি।'

তারপর—? 'ছেড়ে দিলুম পথটা বদলে গেল মতটা ?'

'তা এটা বোধহয় পাকাপাকিই ?'

ব্যঙ্গ হাসি হেসে শুভেন্দু শ্যালকের মুখের দিকে চাইলেন। আরক্ত হয়ে উঠল মানিকের মুখ।

তেতো-ওষুধের মত সে এই শ্লেষ পরিপাক করল। বলল—'সেজদি এসেছেন—তাঁরই আত্মীয়া। আপনি ভেতরে চলুন—ডাকছেন সেজদি।'

'চল।' আন্তরিক ভাবেই এবার বললেন শুভেন্দু।

শুধ্ শুধু আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য করে লাভ কি—? সহাস্যে বললেন—'চল—চল। আমি ত খুব খুশী হয়েছি। রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করছি ভাবী শালাজের কথা ভেবে!'

রসিকতা করে মানিকের কুণ্ঠা ঘুচিয়ে দিলেন শুভেন্দু। মিছি মিছি অশান্তি আর ডেকে আনা কেন!

প্রসন্ন মুখে দুজনে অন্দরে প্রবেশ করলেন।

রাত্রে শুয়ে স্ত্রীর কাছে কথাটা পাড়লেন সোমদেববাবু। পাশাপাশি শুয়ে আছেন দুজনে—স্বামীর প্রস্তাব শুনে হিম হয়ে গেল সর্ব্বাঙ্গ কমলার!

অন্ধকার ঘর। তাই তাঁর বিবর্ণ মুখ সোমদেববাবু দেখতে পেলেন না। কিছুদিন আগে হলেও স্বামীর এ-প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিতেন কমলা। কিন্তু আজ—!

স্ত্রীকে নিরুত্তর দেখে সোমদেববাবু হেসে বললেন—'তুমি বোধ হয় অবাক হয়ে গেছ কমলা আমার এই অসম্ভবের স্বপ্ন দেখার জন্যে—না?

কিন্তু সত্যিই কি আর একেবারে অসম্ভব? রূপেগুণে কোনখানেই ত ঝুমি অমিতের অযোগ্য নয়। তোমার কি মনে হয়না বিধাতা পরস্পরের জন্যেই ওদের সৃষ্টি করেছেন—? আর আমার মনে হয় ওরা দুজন দুজনকে পছন্দও করে। সতীশবাবুর কাছে আমি যাব। টাকার কথাই তুমি বোধ হয় ভাবছ,—না? কিন্তু ছেলেকে দেখলেই বাপকেও চেনা যায়। এতদিনে সত্যিকারের বড়লোকের দর্শন পেয়েছি। সতীশ বাবু টাকার দাবী করবেন আমার মনে হয় না। তবে বড়লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে গেলে খরচ একটা আছেই—সেও আমি ভেবে রেখেছি।'

ক্ষীণ কণ্ঠে কমলা বললেন—'কিন্তু কোথায় আমাদের অত টাকা··'

'টাকার জন্যে অত ভেব না।' স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে চুপি চুপি সোমদেববাবু বললেন—'বাড়ীটা ভাবছি বাঁধা দেব—ওকে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি—যদি অমিতাভের হাতে তুলে দিতে পারি—তাহলে আমাদের আর ভাবনা কি কমলা? আমাদের দিন তারপরে যেমন করেই হোক—চলে যাবে।'

'কিন্তু ঝুমি রাজী হবে কি?

চমকে উঠলেন সোমদেববাবু।

সত্যি, একথা ত তাঁর একবারও মনে হয়নি।

যে আত্মসম্মানবোধ মেয়ের—যে অভিমানিনী সে—বাবা-মাকে আশ্রয়চ্যুত করে সে ত বড়লোকের বৌ হতে কিছুতেই রাজী হবে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোমদেববাবু বললেন—'তুমি ঠিকই বলেছ, জানতে পারলে সে কিছুতেই রাজী হবে না। আর তার চোখকে ফাঁকি দিতেও কি আর পারব আমরা—? তবে একবার দেখব

চেষ্টা করে। অমিত শীঘ্রই বিলেত যাচ্ছে—তার আগেই একবার সতীশবাবুর কাছে প্রস্তাবটা করে রাখতে দোষ কি?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কমলা।

দোষ আর কি! কিন্তু দোষ কি সত্যিই নেই? বিধাতার কাছে ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নেই হয়ত—কিন্তু কমলা জানেন—গরীব হওয়াই একটা বিরাট অপরাধ বড়লোকদের কাছে।

সোমদেববাবুর মত কমলা আশা করতে পারেন না। অমিতাভের মতই যে তার বাপও সরল উদারহৃদয় হবেন তার সম্ভাবনা কোথায়?

ছেলেকে দেখেই কি সব সময় বাপের পরিচয় পাওয়া যায়?

নবেন্দুর সঙ্গে শুভেন্দুর মিল কতটুকু?

ধনী নবেন্দুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন মহাদেববাবু। কিন্তু শুভেন্দুর কোন গরীব বন্ধু নেই। মনে প্রাণে তিনি দরিদ্রকে ঘৃণা করেন। গরীব বোনের বাড়ী এসে নিজেকে অশুচি বোধ করেন।

মৃদুস্বরে কমলা বললেন—'কথা পেড়ে রাখতে পার—কিন্তু—'

'কিন্তু অনেক আছে কমলা। অমিত ফিরে আসতে দেরী আছে। তবু ভাবছি একবার অমিতের বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

শুভেন্দুর কথাটা মনে পড়ে কমলার সর্ব্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে আসে। যদি সোমদেববাবুকে সেই ইঙ্গিত করেন সতীশবাবু? সেই ঘৃণিত মর্ম্মঘাতী ইঙ্গিত?

অস্ফুটে কমলা বললেন—'না—না—কাজ নেই।'

বিস্মিত হন সোমদেববাবু তাঁর এই অসংলগ্ন কথায়।—'কি হয়েছে কমলা?'

সোমদেববাবুর প্রশ্নের কোন উত্তর দেন না কমলা। ধীরে ধীরে নিজেকে সম্বরণ করেন।

এ দুঃখের ভাগ আর কাউকে দিয়ে হাল্কা হওয়া যায় না। এ সংশয় কেমন করে জানাবেন তিনি! তাঁর ভাই-ই যে একথা বলেছে।

সে যাই করুক তার সম্বন্ধে অন্য কারু কাছ থেকেই যে বিরুদ্ধ সমালোচনা কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না তিনি।

সোমদেববাবু আর কিছু প্রশ্ন করেন না। কিন্তু অনুমান করেন—শুভেন্দুর কাছ থেকেই হয়ত কোন কটু মন্তব্য শুনেছেন কমলা। ভীত হয়েছেন তাই।

ভাইয়ের সম্বন্ধে কমলার মন অতি স্পর্শ-কাতর।

তাই কৌতুহল হলেও আর কোন প্রশ্ন করেন না। ভাবতে থাকেন তিনি। সত্যিই কি এ একেবারেই আকাশ-কুসুম? অমিতাভ কিসের আকর্ষণে আসে প্রত্যহ? একবার আভাষ ইঙ্গিতে বুঝবেন তার মন। তারপর যাবেন সতীশ মিত্রের কাছে।

কমলার কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে আশার বেলুনটা তাঁর অনেকটা চুপসে আসে। অমিতাভকে রোজই প্রত্যাশা করেন সোমদেববাবু—কিন্তু প্রতিদিনই তাঁকে নিরাশ হতে হয়।

তবে কি তাঁর অনুমান ভুল?

যার কাছে কোন উৎসাহই পাননি—তারই কাছে নিজের সংশয় প্রকাশ করে ফেলেন একদিন। 'অমিত আসে না কেন বলত কমলা?'

'কি করে জানব বল?' ম্লান হেসে কমলা বলেন—'হয়ত নানা কাজে ব্যস্ত আছে।'

চিন্তিতভাবে সোমদেববাবু বললেন—'সেটা খুবই সম্ভব। তবে

যাওয়ার আগে আসবেই একবার দেখা করতে—তার পরেই আমি যাব তার বাপের কাছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে কমলা বললেন—'সেই ভাল। তার মন বুঝে দেখে তারপর যাওয়াই ভাল। যদি সত্যিই তার এতে মত থাকে—আসবেই দেখা করতে।'

'হুঁ।' অন্যমনস্ক হয়ে যান সোমদেববাবু। কি এমন কাজ তার যে একবারও আসবার সময় হয় না? তবে কি ভুল করেছেন তাঁরা? অমিতাভ সহজ সৌজন্যে মিশেছে হয়ত—তাঁরা তাকেই অনুরাগ বলে ভুল করেছেন।

মেয়ের দিকে বার বার চেয়ে দেখেন। এই কদিনেই সে যেন শীর্ণ হয়ে উঠেছে। চোখমুখে তার ঔৎসুক্যের লেশমাত্রও নেই—নির্লিপ্ত মুখ কিন্তু সেই মুখে বেদনার ছায়া।

অমিতাভের ওপর তার অনুরাগ ত ভুল নয়।

অমিতাভ কি তার এ অনুরাগের কোন মর্য্যাদাই দেবে না?

যাবার দিনও চলে যায় অবশেষে—অমিতাভ আর আসে না।

নিয়মিত কলেজ যায় ঝুমি। গানের স্কুলে যায়। মা-বাপের বৈকালিক আড্ডায় তেমনি করেই হাসিমুখে গল্প করে তবু কমলার বা সোমদেববাবুর বুকের বোঝা হালকা হয় না।

একটি একটি করে দিন—ক্রমে মাস অবশেষে বর্ষও শেষ হয়।

সাগর পার থেকে অমিতাভের একটি চিঠিও আসে না। নিজের ওপর একটা অহেতুক ক্রোধে সারা অন্তর দগ্ধ হয় সোমদেববাবুর।

তিনি যদি এই মায়া-মৃগকে ঘরে না আনতেন, যদি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে না দিতেন তাহলে তাঁর শুভ্র কমলে কীট প্রবেশ

করত না। এতদিন কোন একটি দরিদ্র সচ্চরিত্র ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তাকে সুখী করতে পারতেন।

কি করে যে মতিভ্রম হয়েছিল তাঁর। কেন ছুটেছিলেন সোনার হরিণের পিছু পিছু? না একবার শেষ চেষ্টা করবেন তিনি! মেয়ের চেয়ে কিছু তাঁর মান-মর্য্যাদা বেশী নয়। কমলাকেও না জানিয়ে বহুবার ইতস্ততঃ করে অবশেষে একদিন তিনি এসে দাঁড়ান সতীশবাবুর বাড়ীর গেটের সামনে।

কিন্তু নিরাশ হয়েই তাঁকে ফিরতে হয়।

গেটের কাছে দারোয়ানের মুখে তিনি খবর পান সতীশবাবু কলিয়ারী দেখতে গেছেন—কবে ফিরবেন স্থিরতা নেই।

চিন্তিত মুখে সোমদেববাবু ফিরে আসেন। না—আর কোন আশা নেই। বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তাঁর। মানুষের কতটুকু ক্ষমতা? অদৃষ্টের হাতের ক্রীড়নক সে। সুখী করব মনে করলেই কি আর সুখী করতে পারে বাপ-মা? সময়—সময়ই একমাত্র ওষুধ। সময়েই এ ক্ষতে প্রলেপ পড়বে। সময়ে সবই ভুলে যাবে ক্রমশঃ—। কিছুদিন ধৈর্য্য ধরতেই হবে তাঁদের। তারপর—

হাসি পায় সোমদেববাবুর।

হায় মোহময়ী কুহকিনী আশা! গরীব স্কুল-মাষ্টারকে নিয়ে একি রঙ্গ তোমার? সব বুঝেও মানুষ তোমার কুহকে কেন এত মুগ্ধ হয় না—না—তোমার কোন দোষ নেই। তুমি আছ বলেই—আজও পৃথিবীতে হাসি-গান আছে। মমতাময়ী তুমি। সন্তপ্ত সন্তানকে কোলে করে সান্ত্বনা দাও—ভুলও। তাই পৃথিবী আজও রূপে-গন্ধে-বর্ণে অপরূপা।

সব যেন শূন্য মনে হয় হেমবরণীর।

এই লোকজনের কোলাহল-মুখরিত বাড়ী—এত কাজের ভীড়ে থেকেও তিনি নিজেকে কি রকম নিঃসঙ্গ মনে করেন। অকারণেই চোখে জল এসে পড়ে।

চমকে মুখ মুছে মনে মনে বলেন—ষাট্ ষাট্। গোপালকে পাঠিয়ে কি মা যশোদার এমনিই শূন্য লেগেছিল?

দুটি বছরের জন্যে ত দূরদেশে পড়তে গেছে অমিত—তাতেই এত ভাবনা—এত ভয়? তাঁর এই অহেতুক আশঙ্কায় কতবার সকৌতুকে বলেছে অমিত—

'সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গ জননী
রেখেছ বাঙ্গালী করি মানুষ করনি—।'

এখনও যেন তার কথাগুলো কানে ভাসছে। একথা হয়ত সত্যিই—কিন্তু তবুও বাঙ্গালী মায়ের এ দুর্ব্বলতা—এ ব্যকুলতা যে যায় না!

থেকে থেকে অমিতাভের ঘরে চলে আসেন হেমবরণী। তার জিনিষপত্র সযত্নে গুছিয়ে ধুলো ঝেড়ে রাখেন—তার ওপর সস্নেহে হাত বুলোন।

দেওয়ালে টাঙ্গানো অমিতাভের বড় ফটোটার দিকে চেয়েই তাঁর কত সময় চলে যায়।

চোখের জল ছেলের অমঙ্গল আশঙ্কায় জোর করেই সামলান—বুকের মধ্যে কিন্তু একটা যন্ত্রণা হতে থাকে।

'ওগো—শুনছ—' সতীশ বাবু এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

চমকে উঠলেন হেমবরণী। অপ্রতিভ হয়ে বললেন—'কিছু কি বলছ?'

সতীশবাবু চিন্তিত মুখে বললেন—'বলব আর কি! কি রকম করছ তুমি বলত? এই কদিনেই যে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছ! ছেলে কি কারু বিদেশে যায় না? প্রত্যেক সপ্তাহে চিঠি পাচ্ছ তার—তবু এত ভাবনা—?'

হেমবরণী নত মুখে বসে রইলেন।

সস্নেহে সতীশবাবু বললেন—'বড় ফাঁকা লাগছে হেম, না? বলত—মল্লিকে নাহয় কিছুদিন এসে থাকতে বলি।'

'না—না—'

সজোরে ঘাড় নেড়ে হেমবরণী বললেন—'না—না—ছিঃ! তাকে এরি মধ্যে আবার আনাবে কি—এইত গেল। ওরা মনে করবে কি বল ত? এমনিতেই আমি সামলে নেব। এখন প্রথম—'

চাপা কান্নায় তাঁর গলার স্বর বুজে এল। তাঁর মাথায় সস্নেহে স্পর্শ করে সতীশবাবু বললেন—'তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি হেম—আমারই কি আর ভাল লাগছে? কিন্তু ছেলের ভবিষ্যতের জন্যে—তাকে মানুষের মত মানুষ করে তুলতে হলে যে এটুকু কষ্ট সহ্য করতেই হবে।'

ক্ষীণস্বরে হেমবরণী বললেন—'সে ত ঠিকই।'

সহাস্যে সতীশবাবু বললেন—'কতবার তাই তোমায় বলেছিলুম—অমিতের বিয়েটা দিয়ে দাও। একটি টুকটুকে বৌ চোখের সামনে ঘুরে বেড়ালে—কত তুমি অন্যমনস্ক হতে পারতে দেখতুম!'

হেমবরণীর ম্লানমুখেও হাসি ফুটে উঠল—তিনি বললেন—'কিন্তু খোকা যে কিছুতেই রাজী হল না। আর কজনের বিয়ের পর আমার ও সব উৎসাহ উড়ে গেল। মল্লির মেয়ে দেখতে যাওয়া—শেষ পর্য্যন্ত

খোকা বন্ধই করে দিল দেখলে ত? যাক—এ ভালই হয়েছে। এসব কাজ ধীরে-সুস্থেই ভাল।'

চিন্তিত মুখে সতীশবাবু বললেন—'ভাল ত সত্যিই। কিন্তু তুমি দিন দিন যা আরম্ভ করেছ—! চল—না হয়—দিনকতক আমরা বাইরে ঘুরেই আসি।' প্রতিবাদ করে হেমবরণী বললেন—'এখানে এসব তা হলে কে দেখাশোনা করবে? আমার জন্যে তুমি ভেব না। এখানে তবু কাজ নিয়ে ভুলে আছি। দূরে গেলে আরই মন হু হু করবে।'

সতীশবাবু বলেন—'না হয় আমাদের কলিয়ারীতেই দিনকতকের জন্যে চল। সেখানে অমিত কত কি করেছে সে ত তুমি দেখনি এখনও? আমায় চিঠি লিখেছে—সে আসবার আগে হাসপাতালটা যেন আমি তৈরী করিয়ে ফেলি। আমায় একবার দেখাশোনার জন্যে যেতেই হবে—তুমিও চল না?'

হেমবরণী বললেন—'না গো, এখন আমি যাব না। খোকার সঙ্গে একেবারেই দেখতে যাব—। তোমার সঙ্গে গোবিন্দ যাবে এখন। কোন অসুবিধে হবে না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সতীশবাবু বলেন—'আমি কি আর নিজের জন্যে বলছি? দুদিন ঘুরে এলে মনটা ভাল হত।—যাই হোক, তুমি যখন যাবেই না তখন কি আর করা যাবে? সাবধানে থেক—আর কাজকর্ম্ম এবার একটু কমিয়ে দাও। চিরদিন কিছু মানুষের শরীর সমান যায় না।'

সতীশবাবু চলে গেলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হেমবরণী।

সত্যিই শরীর যেন আর বইতে চাইছে না। থেকে থেকে বুকের মধ্যে এযে কী এক যন্ত্রণা স্থরু হয়েছে।

কিন্তু সে কথা স্বামীকে বলেন না। কি জানি যে ভীতু মানুষ, ডাক্তার দেখিয়ে হৈ-চৈ করে হয়ত তাঁকে রুগীর মত বিছানায় শুইয়ে রেখে দেবেন। আর কাজ না করে বিছানায় একা পড়ে আছেন একথা ভাবতেও হেমবরণীর ভয় করে।

সংসারের তাহলে কী বিশৃঙ্খল অবস্থাই না হবে! ত্রস্ত হয়ে নীচে নেমে যান তিনি।

কত যে কাজ তাঁর সকালের দিকে। ছেড়ে চলে এলে নিজেরই অস্থবিধে হয়—তবু মাঝে মাঝেই পালিয়ে আসেন তিনি অমিতাভের ঘরটিতে।

অমিত নেই তবু তার শত স্মৃতি-বিজড়িত ঘরটিতে ও যেন তার খানিকটা সান্নিধ্য পাওয়া যায়। নীচে নামতে গিয়ে করুণের ঘরের দিকেও চোখ পড়ে যায়। তালাবন্ধ এখন।

চার বছর থেকে সেও ত তাঁরই কোলে মানুষ হয়েছে আজ কত দূরে চলে গেছে।

একষ্টও কম নয় কিছু। তবু ত জানতেন এ তার নিজের বাড়ী নয়—এখানে সে চিরকাল কিছু থাকবে না। করুণের জন্যে ভাবনা যে হেমবরণীর কত ছিল! ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন—সে স্থিতু হয়েছে। ইয়োরোপ ভ্রমণে চলে গেছে। কত দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে—। একটা চিঠিও কিন্তু আর তার পাওয়া যায় না!

তপ্ত একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল হেমবরণীর।

চমকে উঠলেন তিনি। মনে মনে বললেন—যাট্ যাট্!—সুখী হোক সে।

কিন্তু সত্যি কি সে সুখী হয়েছে?

সংশয় যায় না হেমবরণীর। মনে মনে ভগবানের কাছে তার সুখ-শান্তির জন্যে প্রার্থনা করেন তিনি।

ভাল লাগে না—ভাল লাগে না—কিছুই আর ভাল লাগে না ঝুমির। জীবন যেন নিরর্থক, তিক্ত বিস্বাদ হয়ে গেছে—সারা দেহে মনে রাজ্যের অবসাদ—বিষাদ-ঘন ক্লান্তি। তবু কলের পুতুলের মত সব কাজই করে যায় ঝুমি। কিছু ভাল না লাগলেও তোমায় ভাল লাগার ভান করে যেতে হবে।

সমস্ত অন্তর যখন হাহাকার করে মাথাকুটে মরতে চাইছে—তখনও তোমায় হাসতে হবে—জীবনের এই রঙ্গমঞ্চে সে ও যে একজন অভিনেত্রী। তারই মুখের দিকে চেয়ে যে তার বাবা-মা বেঁচে আছেন—সর্ব্বক্ষণই সজাগ দৃষ্টি তাঁদের তার ওপর।

অভিনয় করে যেতেই হবে।

কিন্তু আদরিণী কন্যার ভূমিকায় আর যে এ অভিনয় করা যায় না। বড় মর্ম্মান্তিক এ অভিনয়। ছুটির দিনে আবার সেই রাশিকৃত জামার ছিট নিয়ে বসেছিল ঝুমি।

নিবিষ্ট মনেই কল চালিয়ে যাচ্ছিল—মন কিন্তু চলে গিয়েছিল কোন এক তুষার-ঝরা সমুদ্রপারের দেশে। যেথানে চলে গেছে অমিত।

যাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে—সেই এসে সমস্ত মন জুড়ে বসে থাকে।

তার প্রতিদিনের তুচ্ছ কথা, হাসি, চাহনি ফুল দিয়ে স্মৃতির সুতোয় মালা গেঁথে চলে ঝুমি। সেলাই করতে করতেই এক সময় তার হাত নিশ্চল হয়ে যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুক কাঁপিয়ে বাতাসে মিশে যায়। দরজায় দাঁড়িয়ে অনেক্ষণ ধরেই ইতস্ততঃ করছিল শান্তি। ইংরাজী পাঠ্য-পুস্তকটা পেছন দিকে লুকিয়ে সে ভাবছিল—পড়াটা বুঝে নিতে যাবে কিনা।

মাষ্টারমশাই অসুখের জন্যে কামাই করেছেন।

তিন চারজন কলেজে পড়ুয়া দাদা দিদি থাকলেও তার পড়া বলে দেবার আগ্রহ কারুরই নেই। সবার কাছেই তাড়না খাচ্ছে সে।

ইস্কুলের পড়া কোন দিনই পারছে না—রোজ লজ্জায় পড়তে হচ্ছে।

আজ বড় নিরুপায় হয়েই এসেছে ঝুমিদির কাছে। সাহস কিন্তু কিছুতেই হচ্ছে না সামনে যেতে।

'ঝুমিদি।'

চমকে চাইল ঝুমি দরজার দিকে।

কুণ্ঠিত হয়ে শান্তি দাঁড়িয়ে আছে। হেসে ঝুমি বলল—'কিরে শান্তি, তুই কখন এলি ?'

'আমি অনেকক্ষণ এসেছি ঝুমিদি—তুমি বুঝতেই পারনি।—কি ভাবছিলে ঝুমিদি ?'

রাঙা হয়ে উঠল ঝুমির মুখ। কল চালাতে চালাতে নত মুখে সে বলল—'ভাবছিলুম তোকে কে বলল ?'

'বারে।' ঝুমির পাশে বসে পড়ে ছিটের টুকরোগুলো গুছতে গুছতে মাথা নেড়ে শান্তি বলল—'আমি ডাকতেই তবে চমকে উঠলে কেন ?'

'ঠিক বলেছিস !' হেসে ফেলল ঝুমি।

বলল—'ভাবছিলুম কি জানিস ? ভাবছিলুম তোরই কথা।'

'যাও !' গাল ফুলিয়ে শান্তি বলল—'তোমার খালি ধাপ্পা-বাজী! তুমি মায়ার কথা ভাবছিলে।'

অভিমানে তার গলা বুজে এল।

তার মুখের দিকে চেয়ে আজ হঠাৎ ঝুমির বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

কোন দিন কাছে ঘেঁসতে দেয়নি যাকে—সেও কেন ভালবাসে তাকে ?

গভীর মমতায় তার মাথায় হাত রেখে স্নিগ্ধ স্বরে ঝুমি বলল—'নারে—সত্যি বলছি—তোর কথাই ভাবছিলুম। ভাবছিলুম—তুই আর আসিস না কেন—আমায় ভুলে গেলি নাকি !'

নিজের স্বভাব বহির্ভূত আচরণে ঝুমি অবাক হয়ে গেল।

আহ্লাদে শান্তির গলার স্বর আধ আধ হয়ে উঠল। সে বলল—'হুঁ—ভুলে যাব বইকি ! তোমায় বুঝি কেউ ভুলতে পারে—?'

'পারেনা, না—?'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করল ঝুমি।

চোখের পাতা তার ভিজে উঠল। নিজেকে সামলে আবার সে সেলাইয়ে মন দিল।

নিজের অভ্রভেদী অহঙ্কার নিয়ে সকলের বিচার করে এসেছে

এতদিন—। বুকভরা স্নেহেরও কোন মূল্যই দেয়নি। মনে পড়ে যায় বারবার মল্লিরই কথা। যদি কোনদিন তার সঙ্গে দেখা হয়—ঝুমি তার দুটি হাত ধরে মার্জ্জনা চেয়ে নেবে।

কিন্তু কোনদিন আর দেখা হবেকি—?

শান্তি তখন তার পড়া জানবার কথা ভুলে গিয়ে বহুদিনের সঞ্চিত ভাণ্ডার উজাড় করে গল্প আরম্ভ করেছে। হঠাৎ তার গল্প থামিয়ে রাগ করে শান্তি বললে—'যাও—তুমি কিচ্ছু শুনছ না ঝুমিদি'!

সেলাইয়ের কল থেকে শেষ হওয়া ব্লাউজটা বার করে বাড়তি সুতো-গুলো কাঁচি দিয়ে কাটতে কাটতে ঝুমি হেসে বলল—'শুনছি রে– শুনছি। কিন্তু তুইকি গল্প করতে এসেছিস নাকি—?'

শান্তি ভয়ে ভয়ে তার মুখের দিকে চাইল।

ঝুমিদিকে আজ ত অত দূরের মানুষ মনে হচ্ছেনা! মনে ত হচ্ছেনা ঝুমিদি রাগ করবে!

তার মুখে প্রশ্রয়ের প্রসন্ন হাসি এখনও লেগে আছে। তবু শান্তির সাহস হয়না।

ঢোক গিলে আমতা আমতা করে সে নিজের আগমনের কারণ বিবৃত করে, অপরাধীর মতই নত মুখে বসে রইল!

মমতায় ঝুমির বুক উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

দুহাতে তাকে নিজের কাছে আকর্ষণ করে সস্নেহে ঝুমি বলল—'তা তুই অত ভয়ে ভয়ে বলছিস কেন—? বেশ ত আজ ত ছুটির দিন। তোকে পড়াটা বুঝিয়ে দিতে আমার কোন অসুবিধে হবেনা। বই এনেছিস শান্তি—? কই দেখি—কি পড়া—?'

অবাক হয়ে শান্তি তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ ঝুমি এত

বদলে গেল কি করে—? নাকি সেই এতদিন চিনতে পারেনি—নাহলে ঝুমিদিকে ত তার বরাবর ভালই লেগেছে।

এত কাছে আসবার এর আগে কিন্তু সাহস হয়নি। আহ্লাদে গলে গিয়ে একগাল হেসে শান্তি বলল—'সত্যি বলছ ঝুমিদি? তোমার অসুবিধে হবেনা?'

'নারে—না। নে এসব গুছিয়ে ফেল দিকি। দেখি কিরকম গোছানি মেয়ে তুই। তারপর বইটা নিয়ে পড়ার টেবিলে আয়।'

গর্ব্বিতভাবে জিনিষপত্র সব গুছিয়ে তুলে রাখতে রাখতে পদমর্য্যাদার অনুরূপ গম্ভীরভাবে শান্তি বলল—'দেখনা তুমি, কিরকম গুছিয়ে দি। আমায় বলে মা আলমারীর চাবী ফেলে দেয় গুছিয়ে রাখতে!'

আকাশ মেঘে অন্ধকার।

সারাদিনই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

চেম্বার খুলে বসে আছে সমর। বসে আছে ঘণ্টা দুয়েক হ'ল। এ-পর্য্যন্ত একটিও রোগী আসেনি। একটিও 'কল' আসেনি।

নিমীলিত চোখে সিগারেট টেনে চলেছে সমর। এ্যাসট্রেতে সিগারেটের ছাই জমে উঠছে শুধু। নাঃ—বিরক্তিকর! কতক্ষণ আর ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকা যায়?

উঠে দাঁড়াল সমর।

বেয়ারাকে ডেকে বলল,—"দেখ আমি বাড়ী যাচ্ছি। তুই যেন এক্ষুনি চেম্বার বন্ধ করে চলে যাসনা পরে আসব আবার আমি। 'কল' এলে ফোন করে আমায় জানাবি।"

গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সমর। আবার যেতে বয়ে গেছে। কিন্তু না বলে এলে হরিশবাবুও চেম্বার বন্ধ করে সোজা বাড়ী চলে যাবেন।

অন্ততঃ কল এলে ফোন করেও-ত' জানাতে পারবে বাড়ীতে। না থাকলে তাও যে হবেনা!

গড়ীটা রাস্তার একধারে চাবী বন্ধ করে রেখে ঢুকল সমর।

কিন্তু কি ব্যাপার! বাড়ী যে একেবারে নিঝুম পুরী!

বাইরের ঘরে বাবার তামাক টানার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সামনে এসে দেখল সমর দরজায় তালা দেওয়া এই ঠাণ্ডায় বৃষ্টি মাথায় করে কোথায় বেরুলেন তিনি?

হয়ত ওপরে নিজের ঘরেই আছেন, বেতোরুগী এই ঠাণ্ডায় যাবেন আর কোথায়?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল সমর—। উঁকি মেরে দেখল কৈ ভবেশ বাবু নেইত!

নাঃ—জ্বালাতন! ঐত শরীর তবু এত বেড়াতে যাবার সখ কেন! মার ঘরও খালি,—তবে তিনি হয়ত ঠাকুর ঘরে তেতলায় কিম্বা নীচে ভাঁড়ারে আছেন।

তুই বোনের কোণের দিকের ঘরে ঢুকেও অবাক হয়ে গেল সমর। লীন্টু, শীন্টুরও পাখা গজাল নাকি? আজকের আবহাওয়া বেড়াবারই উপযুক্ত বটে! নিজের ঘরে ঢুকে অপ্রসন্ন মুখে একটা সোফায় বসল সমর।

মলিও তাহলে গেছে কোথাও—ঘরে যখন নেই! হতাশ ভাবে একটা সিগারেট ধরাল সমর।

ঢাকা বারান্দায় টুলু আর ছোট্ট চাকর জগা আছে শুধু। একটা টুল বাজিয়ে টুলু ভাবে বিভোর হ'য়ে আপন মনে গান গাইছে।

ঝির্ ঝির্ ঝির্ বরষা—
সন্ সন্ সন্ বহে হাওয়া
মিছে গান গাওয়া

আধুনিক সঙ্গীত! সমরের অপ্রসন্ন মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। রেডিওর কল্যাণে ছেলেটা ওস্তাদ হয়ে উঠছে।

মল্লিকা এসে ঘরে ঢুকল।

টুলু টুল বাজিয়ে তাল দিয়ে, গলাটা চড়িয়ে দিল—

"ভাঙ্গা ঘরে এল—
এলো বেলো—"

সবিস্ময় হাস্তে মল্লিকার দিকে চেয়ে সমর জিগ্যেস করল—"এ কি গান মলি?"

হেসে ফেলল মল্লিকা।

"ওর সব কথা উচ্চারণ হয়নাত? ভুলেও গেছে খানিক খানিক তাই অমন শোনাচ্ছে। কিন্তু চমৎকার স্বর জ্ঞান টুলুর,—ঠিক স্বরে গাইছে।"

"কার ছেলে দেখতে হবে! তারপর বাড়ী আজ একদম খালি কেন? গেল কোথায় ওরা সবাই? তুমিই বা এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

'আমি? আমি নীচে ছিলুম—অনেক পান সাজলুম কিনা তাই এত দেরী হ'ল। দেখনা সেই থেকে চূণ-খয়েরের দাগগুলো তুলতে পারলুম না কিছুতেই।'

চুণ-খয়েরের দাগে রাঙা আঙ্গুলগুলো নিজের মুঠোয় চেপে ধরে সমর বললে,—'কিন্তু হঠাৎ অত পান সাজবার কি দরকার পড়ল বুঝলুম নাত' মলি? কি ব্যাপার বলত?'

চোখ মুখ কুঁচকে হাসি চেপে মল্লি বলল,—'ব্যাপার গুরুতর—সে তুমি ধারণাও করতে পারবে না !'

উৎসুক চোখে চাইল সমর।

মল্লি বলল,—'আজ হঠাৎ মামার বাড়ী থেকে লোক এসে মাকে নিয়ে গেল,—সেখানে ভাগবত পাঠ হবে। মা আজ আর রাত্রেও আসবেন না। কিছুক্ষণ পরে বাবা আমায় এসে বললেন,—বৌমা গোটা পঞ্চাশ পান ভাল করে মিষ্টি স্থপুরী দিয়ে সেজে দিতে পার? ভগবতীর সঙ্গে আজ বাজী রেখে দাবা খেলব ;—আর আজ রাত্রে সে এখানেই খাবে।—জানত সে কি কি খেতে ভালবাসে? তাকে ডেকে আনতে যাচ্ছি আমি।'

'এই ঠাণ্ডায় বেরিয়ে গেলেন ?'

'দেখনা কাণ্ড ;—আমি কত বারণ করলুম, বললুম ঠাণ্ডায় বেরুবেন না বাবা,—বরং ফোন করে দিন তিনিই চলে আসবেন। আমি সব যোগাড় করে রাখছি। কিন্তু বাবা,—'ফোন করা চলবে না মা,—জাননাত—' বলতে বলতে নিজেই একটা রিকসা ডাকিয়ে চলে গেলেন।'

'হুঁ' সহাস্যে সমর বলল,—'যত বয়স বাড়ছে বাবার ছেলেমানুষীও বাড়ছে যেন! মা থাকলে যেতে পারতেন না। ফোন করা কেন চলবেনা বুঝলেত' মলি ?'

'তা আর বুঝিনি—' হেসে মল্লি বলল,—'সেখানেও যে একজন পাহারাদার আছেন! যা ভয় করেন জ্যাঠামশাই জেঠিমাকে,—তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে আসতে হবেত ?'

একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে সমর বলল,—'আর লীন্ট শীন্টু তারা গেল কোথায় ?'

'তারা? তারা দুজন ত' কলেজ থেকে ফিরে জল খেয়েই পাশের বাড়ীর মাধবীদের সঙ্গে সিনেমা গেল। বাবা তখন বেরুচ্ছিলেন একবার জিগ্যেস করেছিল অবিশ্যি।'

'বাবা নিশ্চয়ই মত দিলেন? মাধবীর দাদা কি যেন নাম কিশলয় না-কি? সেই বকা ছেলেটাও গেল ত?' তুমি বারণ করলে না কেন?'

সমরের অপ্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে মল্লি হেসে ফেলল। বলল—'বারে! আমি বারণ করব কেন?—মাধবীর দাদার নাম মোটেই কিশলয় নয় মলয় নাম ওর। মাধবীও ত' আছে—এত গোঁড়া কেন তুমি? বোলনা দেখি একবার লীণ্টু, শীণ্টুর কাছে!'

বিরক্ত হ'য়ে সমর বলল,—'যাকগে যার যা খুশী করুক। মা থাকুন ধর্ম্ম নিয়ে, বাবা নিজের খোস খেয়াল নিয়ে, আর তুমি তোমার বুড়ো খোকার আব্দার নিয়ে থাক। বোকা যে শীণ্টু লীণ্টু; ভারী বোকা।—সাংসারিক জ্ঞান ওদের মোটেই নেই,—তাই না ভাবনা হয়! মাকেই বলতে হবে,—ধীঙ্গী হয়ে উঠেছে দিনদিন।'

অবাক হ'য়ে গালে হাত দিয়ে মল্লি বলল,—'না বাপু,—তোমারও বড় বাড়াবাড়ি,—এত ভাববার কি আছে বলত?'

ম্লান হেসে সমর বলল,—'না মলি,—তাত' তুমি জাননা,—শীণ্টুকে আমি দুদিন ওর সঙ্গে একা পার্কে দেখেছি;—পাত্র হিসেবে কি ওকে তুমি বাঞ্ছনীয় মনে কর?'

'রাম বল!'

'তবে? বেশী মেলামেশা করতে দেওয়া কি ঠিক? কাজেই মাকে বলতেই হবে,—ধর্ম্ম না করে মেয়েদের দিকে একটু দৃষ্টি রাখতে।'

হেসে মল্লিকা বলল, 'দোহাই তোমার আজকের আকাশের মত

তুমিও আর মুখ অন্ধকার কোরনা। শীন্টু সবই আমায় বলেছে তুমি যা ভাবছ তা মোটেই নয়,—মলয়কে ওরা দু-বোনেই নাচায়। শীলা একটু মজা করতে গিয়েছিল শুধু। তবে ও নিজেই বলেছে আর যাবেনা,—একলা তার সঙ্গে দেখা করতে ওর ভয় করে।'

সমরের অন্ধকার মুখ আবার কৌতুকের হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সে বলল,—'কি দুষ্টু বুদ্ধি দেখ! যাইহোক তুমি ওদের বারণ করে দিও, বাঁদর নাচান সব-সময়ে নিরাপদ নয়!'

'সে ওরা নিজেরাই বেশ বুঝতে পেরেছে—আর যাবেনা। দেখ,—দাদার আজ একটা চিঠি পেলুম।'

'কি লিখেছে অমিত?'

'সব খবরই আছে। শুধু আনন্দের সেই সহজ সুরটিই নেই।'

সস্নেহে মল্লির একটা হাত নিজের হাতে ধরে সমর বলল,—'ওটা তোমার মনের ভুল মলি—।'

ম্লানহেসে মল্লি বলল,—'না আমার মনের ভুল নয়; আমার মনে হয় দাদা তাকে ভুলতে পারেনি,—তুমিত সবই আমায় বলেছ—কিন্তু মেয়েটির নাম ঠিকানা বলনি। তোমার মুখে শুনে আমার সন্দেহ হয়—হয়ত মেয়েটি আমার অজানা নয়!'

'না,—সে তোমার অজানা নয়।'

চমকে উঠল মল্লিকা। সমরের দিকে ফিরে উৎসুক ভাবে বলল,—'লক্ষ্মীটি তার নাম বল তুমি। আমার মনে হয় আমি এর উপায় করতে পারব। দাদাকে অসুখী হতে আমি কিছুতেই দেবনা।'

কোমল সুরে সমর বলল,—'সুখী অসুখী কি কেউ কাউকে ইচ্ছে করলেই করতে পারে মলি?'

'তবে তোমায় সংশয়ের মধ্যে রেখে আমার লাভ কি তুমি কিন্তু অমিতকে এ সম্বন্ধে কিছু বোলনা।'

'না—না—আমি দাদাকে কিছু বলবনা। তুমি শুধু বল—কে?'

সিগারেটটা এ্যাসট্রের ওপর নামিয়ে রাখল সমর, মল্লির দিকে চেয়ে সে বলল—'কে সে জান—সোমদেব রায়ের মেয়ে শিখা রায়।'

'শিখা রায়—ঝুমি?'

হ্যাঁ—হ্যাঁ—ডাক নাম তার ঐ বটে, অমিতের মুখে শুনেছি।' উৎসুক চোখে স্ত্রীর আরক্তিম মুখের দিকে চাইল সমর। ক্ষুব্ধস্বরে মল্লি বলল—'তাই বলি! না হলে নিজের পায়ে কুড়ুল আর এমন করে কে মারবে—'

মল্লির কথা আর শেষ হল না—ঝম ঝম করে ফোন বেজে উঠল। সমর বিরক্ত হ'য়ে উঠে গিয়ে ফোন ধরল। 'হ্যালো···কে গোবিন্দ? এ্যাঁ··· এখনও জ্ঞান হয় নি? বাবা বাড়ী নেই?···এক্ষুনি যাচ্ছি···এক্ষুনি।'

পাংশু মুখে মল্লি এসে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল, কম্পিতস্বরে সে বলল,—'কি হয়েছে মার?'

'আঃ—কাঁদছ কেন মলি? কোন ভয় নেই। মা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। বাবা বাড়ী নেই বলে গোবিন্দ ব্যস্ত হয়েছে—। ভয় কি! চল আমার সঙ্গে।'

চোখ মুছে উদ্বেগ ব্যকুল মনে মল্লিকা স্বামীর অনুসরণ করল।

যাবার সময় একবার ফিরে দেখল টুলুর দিকে। তারপর তাকে কোলে তুলে নিয়ে নেমে এল।

মারাত্মক কিছু অসুখ নয় অথচ শয্যাশায়ী করে দিয়েছে কমলাকে। ৭।৮ দিন ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে ভুগেই তিনি এত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন যে আর বিছানা থেকে মাথা তোলবার সাধ্য নেই।

বাধ্য হয়েই বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি। ঝুমিত' কোন কাজ করতেই দিচ্ছে না, টুকীটাকী একটু আধটু কাজ করতেই গেলেই সে বাধা দিচ্ছে রাগ করছে।

কিছু করবার যে সাধ্য আছে কমলার তা নয়, তবু জ্বর জ্বালা নেই অথচ দুর্ব্বলতার জন্যে শুধু শুধু শুয়ে থাকতে হচ্ছে এটা বড় অস্বস্তিকর তার মত কাজের মানুষের পক্ষে।

একহাতে ঝুমি সব সামলচ্ছে। মার যত্ন, রান্না করা, সকলকে খাইয়ে নিজে খেয়ে কলেজ যাচ্ছে আবার কলেজ থেকে ফিরেই সংসারের সব কিছু কাজ।

চেয়ে চেয়ে দেখেন কমলা। তাঁর এককোঁটা ছোট্ট মেয়ে কখন এত বড় হ'য়ে উঠল। এত কাজেরই বা সে হ'ল কবে?

কাজ অবশ্য গরীবের মেয়েকে মার সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু করতেই হয়েছে কিন্তু এমন সম্পূর্ণ সংসারের ভার কোনদিন তার ঘাড়ে পড়েনি। এমন সুশৃঙ্খল ভাবে যে সংসার সে সামলাতে পারে তাও এতদিন জানা ছিল না কমলার। কাজ করে ঘুরে বেড়ায় ঝুমি, আর কমলা চেয়ে চেয়ে দেখেন তাকে।

বেশ রোগা হয়ে গেছে ঝুমি। গোলাপী রং তার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অকারণে বার বার কাছে এসে সেই এলো মেলো গল্প করা নেই, সেই উচ্ছ্বসিত হাসি নেই।

উচ্ছল গিরি নির্ঝরিণী যেন হঠাৎ স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কমলার। শুয়ে শুয়েই দেখতে পাচ্ছেন তিনি

রান্নাঘরের খানিকটা অংশ কি রান্না চাপিয়ে ঝুমি পীড়িতে হাঁটুর ওপর মুখ রেখে বসে আছে।

মেয়ের আনমনা মুখের দিকে চেয়ে কমলার চোখ জলে ভরে উঠল। কি ভাবছে ঝুমি তা তিনি জানেন—।

বুকের ভেতর তাকে ছোট্ট মেয়ের মত লুকিয়ে যদি পৃথিবীর সব রূঢ় আঘাত থেকে বাঁচাতে পারতেন। সত্যই অন্যমনস্ক হয়ে গেছে ঝুমি।

মন বড় চঞ্চল। তাকে কিছুতেই সংযত করতে পারে না। তার রাজ্যে বিধি নিষেধ নেই। অসম্ভব বলে কোন কথা নেই। আপন খেয়ালে সে দিবা স্বপ্নের জাল বুনে চলে।

কমলার ডাকে সম্বিত ফিরে পায় ঝুমি। রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। বিহ্বল নেত্রে কিছুক্ষণ মার মুখের দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করল, 'আমায় কিছু বলছ মা?'

'হ্যাঁরে—। তোকে যে ডাকছেন—'

'বাবা ডাকছেন?' অপ্রতিভ হাসি হেসে রাঙা মুখে চলে গেল ঝুমি।

সোমদেববাবু বললেন,—'তোর একটা চিঠি আছে ঝুমি।'

বুকের রক্ত উত্তাল হ'য়ে উঠল ঝুমির। কে তাকে আজ চিঠি লিখল? দীর্ঘ উনিশ বছরের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত সে কারুর কাছে থেকে চিঠি পায়নি। কাউকে চিঠি লিখবার দরকারও হয়নি তার। কম্পিত হাতে চিঠিটা তুলে নিল ঝুমি।

খামের অক্ষরগুলির দিকে চেয়ে তার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। এই মোটা মোটা গোটা গোটা মুক্তার মত অক্ষরগুলি যে তার বড়

পরিচিত। মল্লি—মল্লি লিখেছে তাকে চিঠি? এতদিনেও তাহলে তাকে ভোলে নি সে? কি লিখেছে মল্লি—তার প্রিয় বান্ধবী? কি বার্ত্তা বয়ে এনেছে এ চিঠি?

চিঠিটা হাতে করে কতক্ষণ অভিভূতের মত ঝুমি বসে রইল।

অশ্রুবাষ্পে তার চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে গেল! তার রূঢ় আচরণের ক্ষমা করেছে তাহলে মল্লি,—আজও সে তাকে এত ভালবাসে?

খাম ছিড়ে ব্যগ্র হয়ে ঝুমি নীলাভ চিঠির কাগজখানা তার চোখের সামনে তুলে ধরল।

'আমার আদরের ঝুমি—' অদম্য বেদনোচ্ছ্বাস সামলাবার জন্যে ঝুমি তার অধর দংশন করল। তবুও চোখের জলের ফোঁটা পড়ে কয়েকটা অক্ষর ঝাপ্‌সা হয়ে গেল।

হাতের মুঠোয় সেটা চেপে রেখে সে হৃদয়াবেগ সম্বরণ করতে লাগল।

এ শুধু মল্লির পক্ষেই সম্ভব। শুভ্র মল্লিকাফুলের মতই যার কোমল মন সেই পাষাণী শিখাকে একথা লিখতে পারে।

বুকের উত্তাল তরঙ্গ খানিক শান্ত হতে চোখ মুছে চিঠিটা পড়তে লাগল ঝুমি।

আমার আদরের ঝুমি,—

ভাই বহুদিন পরে তোকে চিঠি লিখতে বসেছি। হয়ত তুই আমায় ভুলেই গেছিস। হয়ত চিঠিটা পড়ে খুব বিরক্তই হয়ে উঠবি। (যদিও একথা আমি এখনও বিশ্বাস করিনা) তবে লিখছি নিতান্ত প্রাণের দায়ে। না লিখে আমার উপায় নেই বলেই লিখছি।

আমার মা হঠাৎ হার্টের অসুখে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়েছিলেন, খুবই ভুগলেন তিনি। মাঝে খুব বাড়াবাড়িই হয়েছিল। তাই দাদাকে

বিলেত থেকে চলে আসতে হয়েছে। এখন মা অনেক ভালো—উপস্থিত আর কোন ভয় নেই।'

ঝুমির মুখে হাসি ফুটে উঠল। মল্লিটা চিরকাল আবোল তাবোল বকে,—এতদিন বাদে চিঠি লিখছে তা নিজের খবর কিছুই নেই—। এসব লেখবার কি দরকার? আবার খোঁটাও দেওয়া হয়েছে! যাইহোক চিঠিটা শেষ করা যাক।

'মা দাদার বিয়ে দেবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু দাদা যে আরেকজনকে মন প্রাণ সব সমর্পণ করে বসে আছেন তাত' আর মা জানেন না! আমিও জানতুম না তার 'জীবন মরণ হরণকারিনী'র নাম,—সম্প্রতি জেনেছি।'

সকৌতুকে ঝুমি চিঠিটা পড়ে চলল।

'আমার মা'র কথাত' তোকে কতদিন বলেছি ঝুমি,—জগদ্ধাত্রী প্রতিমা যদি দেখে থাকিস তাহলেই মাকে কল্পনা করতে পারবি,—এমন মার স্নেহ যে পাবে সে পরম সৌভাগ্যবতী।

সেদিন মা'র কাছে বললুম,—'মা, দাদার পাত্রী আমি ঠিক করেই রেখেছি—সে আমারই বন্ধু ঝুমি।'

দাদা পাশে বসেছিল চমকে উঠে বিবর্ণ মুখে আমার দিকে চাইল তারপর উঠে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

ঝুমির মুখ থেকে কৌতুকের হাসি মিলিয়ে গেল পাংশু মুখে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে সে চিঠিটা পড়তে লাগল।

'—মাত' তক্ষুনি রাজী। বললেন—'মলি তাকে নিজেই আমি দেখতে যেতুম কিন্তু এখনত যেতে দিবিনা তোরা। তুই একবার তাকে আমায় দেখা।' আমি মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলুম,

দাদা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমায় দেখে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলল। স্পষ্ট বুঝলুম সে কাঁদছে। আমার দাদার চোখে জল আমি এই প্রথম দেখলুম। কীযে আমার কষ্ট হ'ল তা' চিঠিতে লিখে জানাব কেমন করে! ধরা গলায় দাদা বলল, 'মল্লি,—আর আমায় লজ্জা দিসনি ভাই।'

আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না। ছুটে পালিয়ে এলুম। একা ঘরে কতক্ষণ পড়ে পড়ে কাঁদলুম। কি হয়েছে আমি কিছুই জানিনা,—কিন্তু দাদা যে খুব আঘাত পেয়েছে তাত' দেখতেই পাচ্ছি।

আমি জানি অহেতুক আত্মসম্মান বোধ তোকে অনেক সময় কঠিন দুর্ব্বোধ্য করে তুলেছে। জানি যদিও আঘাত দিয়েই থাকিস—তার শতগুণ আঘাতে জর্জ্জরিত তুই নিজেই হচ্ছিস। তবু সংশয় ত' যায় না। সংশয় যায়না বলেই নিজে গেলুম না তোকে আনতে। যদি আমায় ফিরিয়ে দিস তাহলে সে আঘাত দাদা আর সহ্য করতে পারবে না। তবু প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রতীক্ষা করছি তোর আগমনের। আমার ভালবাসা নিস। তোর

মল্লি—

কমলা রান্নাঘরের পীড়িতে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। ঝুমি তখনও এল না দেখে তরকারীটা নামিয়ে রেখে বাইরের ঘরে সোমদেব বাবুর কাছে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাকে না দেখে অবাক হয়ে গেলেন কমলা। সোমদেববাবুকে জিগেস করলেন,—'ঝুমিকে ডেকেছিলে কেন? কোথায় গেল সে?'

সোমদেববাবু বললেন,—'একটা চিঠি এসেছিল ওর,—সেই জন্যেই ডেকেছিলুম।'

পরীক্ষার খাতা নিয়ে তিনি ব্যস্ত আছেন দেখে কমলা আর কিছু বললেন না।

উদ্বেগে তাঁর বুক দুরু দুরু করতে লাগল। চিঠিটা পেয়েছেত' অনেকক্ষণ,—তবে এখনও ঘর থেকে বার হয়নি কেন ঝুমি? কে লিখেছে তাকে চিঠি? কি লিখেছে?

উদ্বিগ্ন হয়ে কমলা ঝুমির ঘরে প্রবেশ করলেন। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঝুমি নিঃশব্দে বসে আছে। বিছানার ওপর খোলা চিঠিটা পড়ে আছে।

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কমলা—'কে লিখেছে চিঠি ঝুমি?'

মুখ না ফিরিয়েই ধরা গলায় ঝুমি বলল,—'মল্লি।'

গলার স্বর শুনে সন্দেহ হল কমলার সে বোধ হয় এতক্ষণ কাঁদছিল।

'কে লিখেছে?'

ঝুমি কোন উত্তর দিল না, নতমুখে শুধু চিঠিটা মা'র হাতে তুলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

রুদ্ধ নিশ্বাসে কমলা চিঠিটা পড়তে লাগলেন—আনন্দে বেদনায় তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। চিঠিটা রেখে দিয়ে তিনি মেয়ের মাথাটা বুকে চেপে ধরলেন।

মেয়ের ঘন চুলেভরা মাথাটায় হাত বুলতে বুলতে সস্নেহে বললেন,—'তোরত' একবার যাওয়া উচিত ঝুমি, যাবি না?'

মার বুকে মুখ লুকিয়ে অস্ফুট স্বরে সে বলল 'যাব।'

আনন্দে কমলার সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেল। কন্যার ললাটে প্রগাঢ় চুম্বন করে কমলা বললেন,—'তাহলে এক্ষুনি তৈরী হ'য়ে নে ঝুমি,—আমি যাই বলে আসি—তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।'

ঝুমি দুহাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে রইল।

একখানি প্রিয় পরিচিত সুন্দর মুখের কথা ভেবে ক্ষণে ক্ষণে সে রোমাঞ্চ অনুভব করতে লাগল।

চিঠিটা হাতে নিয়ে কমলা সোমদেববাবুর কাছে এলেন।

খাতাপত্র গুছিয়ে তুলে রাখছিলেন তিনি, হেসে বললেন, 'কি কমলা?'

উদ্ভাসিত মুখে কমলা বললেন—'অমিতাভের বোন মল্লিকা চিঠি দিয়েছে ঝুমিকে।'

চিঠিটা সোমদেববাবুর হাতে তুলে দিলেন কমলা।

সাগ্রহে চিঠিটা পড়ে শেষ করে সোমদেববাবু বললেন—'অমিতাভের ওপর আমরা অবিচার করেছিলুম কমলা—।'

এতদিনে তাঁর বুকের পাষাণ ভার যেন কমে গেল। স্ত্রীর দিকে চেয়ে তিনি বললেন—'তাহলে—' 'হ্যাঁ,—' কমলা বললেন—'ঝুমিকে একবার ওখানে দিয়ে এস—।'

কমলা নিজের ঘরে এলেন—। কি আনন্দ তাঁর আজ! কিন্তু তার সঙ্গে একি ব্যথা—।

তাঁর ঘর আজ শূন্য হয়ে যাবে। চমকে উঠলেন কমলা—ছিঃ—ছিঃ—এ সব কী ভাবছেন তিনি। অমিতাভকে যে তিনি ছেলের মত পাচ্ছেন—তাঁর ঘর শূন্য হোক—মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে আজ।

সোমদেববাবুও ভাবছিলেন সেই কথাই। আদরের দুলালী তাঁর আজ আরেকজনের হয়ে যাবে—। উপযুক্ত পাত্রের হাতে তাকে সমর্পণ করছেন—এর চেয়ে বেশী আনন্দের আর কি আছে—। তবু বুকের ভেতর এত শূন্য হয়ে যাচ্ছে কেন? চশমার কাঁচটা ভাল করে পরিষ্কার করতে লাগলেন তিনি।

জগতে এতসুখ এত আনন্দও আছে !

কমলা স্মিত মুখে আবার প্রবেশ করলেন,—হাতে তাঁর নীল রংএর একখানা মাদ্রাজী শাড়ী জরীপাড় তার, ঢালা জরীর চওড়া আঁচলা !

বড় সখছিল তাঁর মেয়েকে শাড়ীটা পরাবার। কোনদিন পারেননি। শিউরে উঠছে ঝুমি,—'অত ঘোর রং,—অত জমকালো শাড়ী পরে আমি কিছুতেই রাস্তায় বেরুতে পারব না মা—।' এই ছিল তার উত্তর।

কমলা বললেন,—'এইনে শাড়ীটা—নে উঠে পড়—তৈরী হয়ে নে ঝুমি।' ব্যস্ত হয়ে কমলা প্রস্থান করলেন।

হঠাৎ যেন শরীরে বল ফিরে পেয়েছেন তিনি। খুসীতে হাল্কা মেঘের মত ভেসে বেড়াচ্ছেন।

কি আর করা যায়? যখন অত ঘোর নীল শাড়ীখানা মা দিয়ে গেলেন তখন তার উপযুক্ত ব্লাউস ও খুঁজে বার করতে হয় ঝুমিকে।

নীল সার্টিনের ব্লাউসের সঙ্গে শাড়ীটা পরে একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু করুণ, মধুর সলজ্জ হাসি হাসল সে। বড় ইচ্ছে করছিল একটা কুঙ্কুমের টিপ পরতে কিন্তু লজ্জায় তা আর পারল না। ধীর পায়ে মার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কমলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইলেন মেয়ের দিকে। তারপর সিঁদুর কৌট খুলে সুন্দর দুটি বঙ্কিম ভ্রূর মাঝে অর্দ্ধচন্দ্রের মত ললাটে তাকে একটি সিঁন্দুর টিপ পরিয়ে দিলেন।

সিঁন্দুরের মতই রাঙ্গা হয়ে হয়ে উঠল ঝুমির মুখ। সোমদেব বাবুর সঙ্গে ঝুমি রিকসায় উঠে বসল; ভাগ্যিস রাস্তায় হাঁটতে হল না তাকে, ট্রামে বাসেও যেতে হল না। এই বেশবাস করে এক পাও হাঁটবার ক্ষমতা ছিল না তার।

রিকসাটা মোড় পার হবার সময় পানের দোকানের এক উৎসাহী তরুণ, হঠাৎ গেয়ে উঠল—'রাধা—রাধা—রাধা—

নব অনুরাগিনী—

শ্যাম সোহাগিনী—

কিছুনাহি মানয়ে বাধা—'

চকিত কটাক্ষে একবার সোমদেববাবুর মুখের দিকে চাইল সে না তাঁর কানে যায় নি। কি একটা বই খুলে বসেছেন তিনি।

যেমন প্রতিদিন তাদের গানে রক্তিম হয়ে ওঠে, কিন্তু ঝুমির মুখ তেমনি আজও হয়ে উঠল, কিন্তু সে রাগে নয় অনুরাগের রঙে রাঙা। নবঅনুরাগিনী শ্রীমতীর মতই তার সারা তনুমন অপূর্ব্ব পুলকে শিউরে উঠতে লাগল।